একক ৩৩ ☐ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ঃ মূল ধারণাসমূহ

গঠন

৩৩.০ উদ্দেশ্য

৩৩.১ প্রস্তাবনা

৩৩.২ অর্থশাস্ত্র পরিচিতি

৩৩.২.১ বিদ্যাসমূহের প্রকারভেদ—অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা

৩৩.৩ রাষ্ট্রের উদ্ভব

৩৩.৩.১ রাষ্ট্রের প্রকৃতি

৩৩.৩.২ রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ

৩৩.৪ সপ্তাঙ্গতত্ত্ব—রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান

৩৩.৪.১ স্বামী

৩৩.৪.২ অমাত্য

৩৩.৪.৩ জনপদ

৩৩.৪.৪ দূর্গ

৩৩.৪.৫ কোষ

৩৩.৪.৬ দণ্ড

৩৩.৪.৭ মিত্র

৩৩.৪.৮ উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুরুত্ব

৩৩.৪.৯ উপাদানগুলির সংকট বা ব্যাধি

৩৩.৫ রাজতন্ত্র

৩৩.৫.১ রাজার গুণ

৩৩.৫.২ রাজার কর্তব্য

৩৩.৬ প্রজাবিদ্রোহ

৩৩.৬.১ প্রজাবিদ্রোহের কারণ

৩৩.৬.২ প্রজাবিদ্রোহের ধরন

৩৩.৭ বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা

৩৩.৭.১ মূলনীতিসমূহ

৩৩.৭.২ সন্ধি

৩৩.৭.৩ যুদ্ধ

৩৩.৭.৪ দূতের কাজসমূহ

৩৩.৮ সারাংশ

৩৩.৯ অনুশীলনী

৩৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৩৩.০ উদ্দেশ্য

প্রাচীন ভারতের রাজনীতিচর্চার অন্যতম আকরগ্রন্থ হ'ল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। এই গ্রন্থটি আলোচনার মধ্যে প্রাচীনভারতের রাজনীতি চর্চা সম্পর্কে আমরা পরিচিত হব। এই এককটি পাঠ করে আমরা যে সমস্ত বিষয়গুলি জানতে পারব তা হ'ল---

- প্রাচীনভারতের বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন শাখার মধ্যে রাজনীতি সম্পর্কিত আলোচনা
- রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে কৌটিল্যের বক্তব্য
- রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও প্রকারভেদ
- রাষ্ট্রের উপাদান তথা প্রকৃতিগুলি কী কী
- রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংকট
- রাজতন্ত্রের স্বরূপ, রাজার কর্তব্য
- প্রজাবিদ্রোহের কারণ ও ধরন সম্পর্কে কৌটিল্যের মত
- বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার মূল নীতিসমূহ, সন্ধি ও যুদ্ধের স্বরূপ, দূতের কাজগুলি কী কী
- আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কৌটিল্যের রাজনৈতিক ধারণা, বিশেষ করে বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা সংক্রান্ত ধারণার কোনও প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা সে সম্পর্কে আমরা মতামত তৈরী করতে পারব।

৩৩.১ প্রস্তাবনা

প্রাচীনভারতের রাজনীতিচর্চার অন্যতম নিদর্শন হ'ল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। ১৯০৯ সালে গ্রন্থটি প্রথম ডঃ আর শ্যামশাস্ত্রীর প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হ'লে পণ্ডিতমহলে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এতদিন ইউরোপীয় তাত্ত্বিকগণ মনে করতেন, রাজনীতিচর্চার শুরু হয়েছিল গ্রীসে এবং ভারতীয়গণ, মূলত অধ্যাত্ম প্রবণজাত। এই গ্রন্থটি প্রকাশের পর ভারতীয় তাত্ত্বিকদের মধ্যে এক বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। ঔপনিবেশিক শাসনে ক্ষুব্ধ অথচ ঐ শাসনের মতাদর্শে পালিত ভারতীয় পণ্ডিতগণ প্রমাণ করতে থাকেন ভারতেও গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, প্রভৃতি ধারণাগুলি (যা পাশ্চাত্য ধারণাগুলিরই নির্মাণ) ভারতেও প্রাচীনকাল থেকে ছিল। কৌটিল্য কোন্ সময়ের মানুষ বা কৌটিল্য নামে আদৌ কোনও ব্যক্তি ছিলেন কিনা, থাকলেও মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া হয় কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের তাত্ত্বিক। এই এককে আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রগ্রন্থটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

গ্রন্থটির 'অর্থশাস্ত্র' নামকরণ কেন করা হ'ল সে সম্পর্কে আমরা প্রথমে আলোচনা করব। রাষ্ট্রের উদ্ভব ও প্রকৃতি সম্পর্কে কৌটিল্যের চিন্তাভাবনা আমাদের আলোচনার মূল বিষয়। কৌটিল্য যে সময় রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছেন সে সময়টি হ'ল কৌম সমাজ থেকে রাজতন্ত্র গড়ে ওঠার সময়। স্বাভাবিকভাবেই

রাজার গুণ, কর্তব্য প্রভৃতি বিষযগুলি কৌটিল্যের আলোচনায় প্রধান স্থান নিয়েছে। যুদ্ধজয়ে তথা রাষ্ট্রের সম্প্রসারণে এবং এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে ইচ্ছুক রাজার কী ধরনের নীতি অনুসরণ করা উচিত সেই বিষয়টিই কৌটিল্যের মূল আলোচ্য বিষয়ে। সে সময় বিভিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্র যেমন ছিল, এই সমস্ত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও ছিল বিভিন্ন ধরনের। এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক পরিচালনার ধরন কীরূপ হওয়া উচিত সে সর্ম্পকেও কৌটিল্য বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রজাদের বিদ্রোহের বিষয়টিও কৌটিল্যের দৃষ্টি এড়ায়নি। আমাদের আলোচনায় এ সমস্ত বিষয়গুলিই স্থান পেয়েছে। বর্তমান কালের রাজনীতির পর্যালোচনায় কৌটিল্যের আলোচিত অনেক বিষয়ই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। এ কারণে অর্থশাস্ত্র এযুগেও রাজনীতিশাস্ত্রের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে একইভাবে আকর্ষণীয়।

৩৩.২ অর্থশাস্ত্র পরিচিতি

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত দীর্ঘ সময় জুড়ে আধুনিককালে আমরা রাষ্ট্র বলতে যা বুঝি তার বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমশ ভারতে প্রকট হ'তে থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকেই আদিম কৌম সমাজ রূপান্তরিত হয়ে কৌম সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের রূপ নেয়। কৌম সমাজের প্রধান বা 'রাজন' প্রাতিষ্ঠানিক রাজায় পরিণত হয়; এই পরিবর্তন অবশ্য সব জায়গায় সমানভাবে হয়নি। পরবর্তী শতকগুলিতে কৌমতন্ত্র, কৌম সাধারণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের পাশাপাশি অবস্থান লক্ষ্য করি। বৌদ্ধগ্রন্থ অনুযায়ী আমরা জানতে পারি কৌম জনপদ থেকে শাক্য, মল্ল, লিচ্ছবি, বিদেহ প্রভৃতি কৌম সাধারণতন্ত্র গড়ে ওঠে। মহাভারতে ও পাণিনির রচনাতেও আমরা এরকম বহু কৌম সাধারণতন্ত্রের নাম পাই। এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজা নামমাত্র শাসক, যিনি গোটা গোষ্ঠীর সদস্য বা গোষ্ঠী প্রধানদের দ্বারা মনোনীত হ'তেন। নীতি নির্ধারণ ও কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব থেকে যায় গোষ্ঠীর বয়স্ক মানুষ বা গোষ্ঠীপ্রধানদের নিয়ে গঠিত কৌম সংসদের হাতে।

এই ধরনের কৌম সাধারণতন্ত্রের পাশাপাশি চরম কর্তৃত্বসম্পন্ন রাজতন্ত্রও গড়ে উঠতে থাকে। বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা যে ১৬ মহাজনপদের নাম পাই তার মধ্যে কয়েকটি কৌমজনপদ ছাড়া বাকী অধিকাংশই রাজতন্ত্র। এসময় অবন্তী, বৎস, কৌশল মগধ প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি গড়ে উঠতে থাকে; মানুষজনও ক্রমশ পশু শিকার, পশুপালন প্রভৃতি জীবিকা থেকে সরে আসতে থাকে এবং কৃষিকেই প্রধান জীবিকা হিসেবে নেয়। এর ফলে ভ্রাম্যমান জীবনের পরিবর্তে স্থায়ীভাবে বসবাসও শুরু হয়। গ্রাম, জনপদ গড়ে উঠতে থাকে; উদ্বৃত্ত ফসলের বন্টন, জমির মালিকানা প্রভৃতি ব্যাপারে কর্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রের প্রয়োজনও দেখা দেয়। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে নন্দবংশ, মৌর্যবংশ থেকে শুরু করে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-ষষ্ঠ শতকে গুপ্তবংশ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় জুড়ে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র গড়ে উঠতে থাকে। উত্তর-বৈদিক ধর্মসূত্রে, বৌদ্ধগ্রন্থে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, মহাভারতে, রামায়ণে, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, রাজার ক্ষমতা ও দায়িত্ব, রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক, রাজস্ব ব্যবস্থা, সমাজের অনুশাসন প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচিত হ'তে থাকে। এ সমস্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে রাজনীতি বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হ'ল কৌটিল্যের; 'অর্থশাস্ত্র' যা এই এককে আমরা আলোচনা করব।

প্রাচীন ভারতের রাজনীতিচর্চার অন্যতম আকর গ্রন্থ হিসেবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি বিবেচিত হ'লেও গ্রন্থটির বর্তমান রূপ আমরা জানতে পারি মাত্র ৯২ বছর আগে। ১৯০৯ সালে মহীশূরের পণ্ডিত আর শ্যামশাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থটির প্রথম একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। এর আগে কোনও কোনও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বা টীকায় গ্রন্থটির বা গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ থাকলেও গ্রন্থটি আমাদের কাছে ছিল অনাবিষ্কৃত। পনেরটি অধিকরণে বিন্যস্ত, ১৫০টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থটিতে ১৮০টি আলোচ্য বিষয় রয়েছে। প্রাচীনভারতের মানুষজন যে রাজনীতির চর্চা করতেন এবং এই চর্চা যে কতটা উন্নত মানের ছিল তা আমরা গ্রন্থটি পড়ে জানতে পারি। এতদিন পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে প্রাচীন ভারতীয়রা শুধুমাত্র ধর্ম চর্চা করতেন এবং রাজনীতি সম্পর্কে ছিলেন পুরোমাত্রায় অনাগ্রহী। এই গ্রন্থটির আবিষ্কার আমাদের সেই ভুল ধারণাকে পাল্টে দেয়।

কিন্তু অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটির রচনাকাল এবং গ্রন্থকারের নাম নিয়ে তর্কবিতর্ক শুরু হয়। ভিনসেন্ট স্মিথ, জ্যাকোবি, টমাস মেয়ার, হপকিন্স, প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং আর শ্যামশাস্ত্রী, গণপতিশাস্ত্রী, জয়সওয়াল প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতগণ অর্থশাস্ত্রগ্রন্থটিকে কৌটিল্য কর্তৃক খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-শতকে রচিত বলে মনে করেন। এই কৌটিল্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (যার রাজত্বকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩-২৯৮) প্রধানমন্ত্রী যিনি বিষ্ণুগুপ্ত বা চাণক্য নামেও পরিচিত। গ্রন্থটির পঞ্চদশ, অর্থাৎ শেষ অধিকরণের শেষাংশে উল্লেখ রয়েছে, 'যিনি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে শস্ত্র, শাস্ত্র ও নন্দরাজগতা ভূমি শীঘ্র উদ্ধার করেছিলেন তিনিই এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। গ্রন্থটির একেবারে শেষে বলা হয়েছে, 'শাস্ত্র সমূহের ভাষ্যকারগণের মধ্যে বহুরকমের মতপার্থক্য লক্ষ্য করে বিষ্ণুগুপ্ত স্বয়ং সূত্রের মাধ্যমে এই গ্রন্থের ভাষ্য ও রচনা করেছেন। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক-এর মতে, মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে অথবা মগধের সিংহাসনে মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে কৌটিল্য মহামন্ত্রীর কর্তব্য থেকে অবসর নিয়ে এই অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি রচনা করেন। ভিনসেন্ট স্মিথ-ও এই মত পোষণ করেন যে, অর্থশাস্ত্র মৌর্যযুগেরই রচনা এবং সেই সময়কার রাজনৈতিক ব্যবস্থারই প্রতিফলন, যদিও এর কোনও কোনও অংশ পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে।

উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করেন জলি, উইন্টারনিজ, কিথ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং ইউ. এন. ঘোষাল, ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ডঃ অতীশ বসু প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতগণ। এইসব পণ্ডিতদের মতে, অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে সংকলন করা হয়েছে। এই মতের সমর্থনে তাঁরা যে সমস্ত যুক্তি গুলি দেখান তা হ'ল (১) গ্রন্থটিতে মৌর্য সম্রাটের নাম কোথাও উল্লেখ নেই, (২) প্লিনী বা মেগাস্থিনিস প্রমুখ যে সমস্ত গ্রীক পর্যটক ভারতে সে সময় এসেছিলেন তাঁদের বিবরণেও কৌটিল্যের বা এই গ্রন্থের কোনও নাম নেই (৩) এই গ্রন্থে রসায়ন, খনি বিদ্যার যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে তা, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারতীয়দের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজানা। সুতরাং, এই সব পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি কৌটিল্যের সিদ্ধান্তসমূহ যা পরবর্তীকালে কৌটিল্যের কোনও শিষ্য বা শিষ্যসংঘ সংকলন করে থাকবেন।

তাছাড়া, মৌর্য প্রধানমন্ত্রী চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত এবং কৌটিল্য একই ব্যক্তি কিনা সে নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। সাধারণত মনে করা হয়, কৌটিল্য শব্দটি নিন্দাবাচক 'কুটিল' শব্দ থেকে এসেছে। গ্রন্থটিতে রাজার কূটনীতি, জটিল ও কুটিল উপায় সমূহ আলোচিত হয়েছে এবং একারণে গ্রন্থকারকে কৌটিল্য বলে উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয় মতটি হ'ল কৌটিল্য শব্দটি একটি গোত্রনাম 'কুটল' থেকে এসেছে।

কুটল বংশে জন্ম বলেই চাণক্যের অপর নাম কৌটিল্য। তৃতীয় মতে, সে সময় ভারতে কুটল নামে এক লিপির প্রচলন ছিল। কুটল লিপি থেকে কৌটিল্য নামটি এসে থাকতে পারে।

অর্থশাস্ত্র ও এই গ্রন্থের রচয়িতা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে এসব মতপার্থক্য থাকলেও এই মতটাই বহু প্রচলিত যে, অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি কৌটিল্যেরই রচনা এবং গ্রন্থটি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই রচিত হয়। আমরা এই মতটিকে গ্রহণ করেই অর্থশাস্ত্র আলোচনায় অগ্রসর হব।

৩৩.২.১ বিদ্যাসমূহের প্রকারভেদ ঃ অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা

অর্থশাস্ত্রের 'বিনয়াধিকারিক' নামে প্রথম অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৌটিল্য সে সময়ের ও তার আগের সময়ের বিভিন্ন বিদ্যাকে ব্যাখ্যা করে চারটি ভাগে ভাগ করেন। (১) আন্বীক্ষিকী বা দর্শনবিদ্যা (২) ত্রয়ী বা ঋক, যজু ও সামবেদ বিদ্যা (৩) বার্ত্তা বা কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য বিষয়ে বিদ্যা এবং (৪) দণ্ডনীতি বা রাজবিদ্যা। এ ব্যাপারে অবশ্য তিনি মানব, অর্থাৎ মনুর শিষ্যদের বার্হস্পত্য বা বৃহস্পতির শিষ্যদের এবং ঔশনস বা শুক্রাচার্যের শিষ্যদের মত আলোচনা করেন এবং সেই সমস্ত মতের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে নিজের মত হাজির করেন; যেমন, মনুর শিষ্যদের ধারণা ছিল আন্বীক্ষিকী বা দর্শন ত্রয়ীবিদ্যার অন্তর্গত; সেহেতু বিদ্যা তিন ধরনের। আবার, বৃহস্পতির শিষ্যগণ বিদ্যাকে বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই দু'ভাবে ভাগ করেন। আবার, শুক্রাচার্যের শিষ্যগণ শুধুমাত্র দণ্ডনীতিকেই একমাত্র বিদ্যা বলে স্বীকার করেন। কৌটিল্যের মতে, মানুষের সামগ্রিক জ্ঞান লাভের জন্য উপরোক্ত চারটি বিষয় সম্পর্কেই জানা দরকার।

আন্বীক্ষিকী বিদ্যার মধ্যে কৌটিল্য তিনটি শাস্ত্রের উল্লেখ করেন— সাংখ্য শাস্ত্র, যোগ শাস্ত্র ও লোকায়ত শাস্ত্র। এখানে লক্ষ করার বিষয় হ'ল কৌটিল্য লোকায়ত শাস্ত্রকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তাছাড়া, কৌটিল্য আন্বীক্ষিকী বা দর্শন/যুক্তিবিদ্যাকে অন্য সব বিদ্যার প্রদীপ স্বরূপ বলে উল্লেখ করেন ; কারণ, দর্শন মানুষের বুদ্ধিকে অবিচলিত রাখে এবং মানুষের জ্ঞান বাক্য প্রয়োগ ও কার্যকারণ বিষয়ে দক্ষতা সৃষ্টি করে।

ত্রয়ী বিদ্যার মধ্যে রয়েছে ঋক্, সাম ও যর্জুবেদ। অথর্ববেদ ও ইতিহাসকে তিনি বেদ পর্যায়ে উল্লেখ করেন। শিক্ষা বা বর্ণের উচ্চারণ সম্পর্কিত শাস্ত্র, কল্প বা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান সম্পর্কিত শাস্ত্র, ব্যাকরণ বা শব্দের অনুশাসন, নিরুক্ত বা শব্দনির্বাচনের উপদেশমূলক শাস্ত্র, ছন্দ নির্ণয়ের শাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র---এই ছয়টি শাস্ত্রকেও কৌটিল্য বেদের অঙ্গ বলে মনে করেন।

বার্ত্তা বিদ্যার মধ্যে রয়েছে কৃষি, গবাদি পশুপালন ও বাণিজ্য সম্পর্কে বিদ্যা। এই বিদ্যা ধান, পশু, নগদ টাকা, সোনা, রূপো, তামা, বনজসম্পদ শ্রম প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে। এই বিদ্যার দ্বারা রাজা নিজপক্ষকে ও শত্রুপক্ষকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

কৌটিল্যের মতে, উপরোক্ত তিনটি বিদ্যার অর্জন ও বাস্তবে প্রয়োগ সম্ভবপর হয় দণ্ডের মাধ্যমে। এই দণ্ড পরিচালন নীতি বা প্রকৃতি সম্পর্কিত যে শাস্ত্র তাই দণ্ডনীতি বা রাজনীতি শাস্ত্র। অর্থশাস্ত্রের শেষ অধ্যায়ে কৌটিল্য এই শাস্ত্রটিকে 'অর্থশাস্ত্র' নামে অভিহিত করেন। এর কারণ হ'ল, মানুষের বৃত্তি বা জীবিকাকে অর্থ বলা হয়। আবার বসবাসকারী মানুষের জমির নামও অর্থ। সুতরাং, যে শাস্ত্র এই জমির দখল ও পরিচালনার উপায় ঠিক করে তার নাম 'অর্থশাস্ত্র'। এই শাস্ত্র লেখাই হয়েছে জমির দখল ও রক্ষার জন্য এবং এই শাস্ত্র

মানুষের মনে ধর্ম, অর্থ ও কামের প্রবৃত্তি ঘটায় ও তাদের রক্ষার বিধান করে এবং অর্থের বিরোধী অধর্ম সমূহের নাশ করে। 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থের প্রথম প্রয়োজন সম্পর্কেও উল্লেখ করেন। দণ্ডনীতি অলব্ধ বস্তুকে লাভ করায়, লব্ধ বস্তুকে রক্ষা করায়, রক্ষিত বস্তুকে বর্ধিত করায় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত বস্তুকে উপযুক্ত পাত্রে বিনিযুক্ত করায়। সুশৃঙ্খলভাবে সমাজব্যবস্থার পরিচালনও ঘটে দণ্ডনীতির মাধ্যমে।

আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, আমাদের আলোচনায় অর্থশাস্ত্র, রাজনীতিশাস্ত্র, দণ্ডনীতি, দন্ডনীতিশাস্ত্র প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে কোনও রকম পার্থক্য না করেই। আসলে প্রাচীন ভারতে রাজনীতি চর্চার বিষয়টি রাজধর্ম, রাজ্যশাস্ত্র, দণ্ডনীতি, দণ্ডনীতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি নামে ব্যবহার করা হ'ত। রাজধর্ম, অর্থাৎ রাজার ধর্ম তথা কর্তব্যসমূহ, রাজ্যশাস্ত্র বা রাজ্যবিষয়ক শাস্ত্র প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যবহার স্পষ্টতই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কোনও সমস্যা তৈরী করে না। রাজতন্ত্রই যেহেতু সে সময়ের স্বাভাবিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সেহেতু রাজধর্ম, রাজ্যশাস্ত্র শব্দগুলির ব্যবহারও স্বাভাবিক। রাজনীতিবিজ্ঞানকেও দণ্ডনীতিশাস্ত্র নামে উল্লেখ করার ব্যাপারে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল ক্ষমতার প্রয়োগ; রাষ্ট্রের এলাকার সম্প্রসারণ, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা, রাষ্ট্র পরিচালনা প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপারে ক্ষমতার প্রয়োজন। দণ্ড শব্দটির দ্বারা এই রাষ্ট্রক্ষমতাকেই বোঝানো হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দণ্ডশব্দটি শুধুমাত্র নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। দণ্ডের মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা বজায় থাকে; পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রকে মেনে চলার প্রবণতা তৈরী করে। দণ্ডের মাধ্যমেই ধর্ম, অর্থ, কাম রক্ষা পায়। এ কারণে কৌটিল্য রাজনীতির বিষয়টিকে দণ্ডনীতি বা দণ্ডনীতিশাস্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেন। অথচ কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেন 'অর্থশাস্ত্র'। গ্রন্থটির শুরুই করেছেন তিনি এভাবে—'পৃথিবীর' (অর্থাৎ বসবাসকারী মানুষের জমির) অর্জন ও তার রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে আগেকার আচার্যগণ যে সমস্ত অর্থশাস্ত্র রচনা করে গেছেন সেইগুলি সংগ্রহ করেই এই অর্থশাস্ত্রখানি রচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের শেষে আমরা অর্থনীতিশাস্ত্রের একটি সংজ্ঞা পাই যা আমরা আগেই বলেছি। শেষের সংজ্ঞাটির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অর্থ শব্দটি একদিকে যেমন বৃত্তি বা জীবিকাকে বোঝায় অপরদিকে মনুষ্যযুক্ত ভূমি বা বসবাসকারী মানুষের ভৌগোলিক এলাকাকে বোঝায়। শেষের অর্থটি গ্রহণ করলে অর্থশাস্ত্রকে রাজনীতিশাস্ত্র হিসেবে উল্লেখ করতে কোনও অসুবিধে হয় না। যেহেতু রাষ্ট্রই জমির দখল, রক্ষণাবেক্ষণ-এর দায়িত্ব নেয়, জনগণের জীবিকার ব্যবস্থা করে, সেহেতু রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনাই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়েও আমাদের জানা প্রয়োজন। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে দন্ড শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমরা জানি, আক্ষরিক অর্থে দণ্ড বলতে বোঝায় শলাকা। এই বস্তুটি দিয়ে প্রাচীনকালে শাসক সম্ভবত অপরাধীকে শাস্তি দিত। একারণে দণ্ড শব্দটির পরবর্তীকালে রাষ্ট্রশক্তির সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। অর্থশাস্ত্রের প্রথম অধিকরণে দণ্ড শব্দটির দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকেই বোঝানো হয়েছে। আবার চতুর্থ ও পঞ্চম অধিকরণে দণ্ড শব্দটির দ্বারা শাস্তি বিধানের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির অন্যত্র, বিশেষ করে, নবম ও দশম অধিকরণে দণ্ড শব্দটি দ্বারা সৈন্য বাহিনীকে বোঝানো হযেছে। অর্থশাস্ত্রে দণ্ড শব্দটির ব্যবহার যেভাবে ঘটেছে তাতে শব্দটির দ্বারা (১) দণ্ডনীতিশাস্ত্র (২) রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও প্রশাসন (৩) বিচার ব্যবস্থা ও শাস্তি বিধাননীতি এবং (৪) সেনাবলকে বোঝানো হয়েছে।

৩৩.৩ রাষ্ট্রের উদ্ভব

গ্রীসের রাষ্ট্রদার্শনিক প্লেটোর 'রিপাবলিক' বা ইংলণ্ডের টমাস হবস এর 'লেভিয়াথান' এর মতো কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' রাষ্ট্রের কোনও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হাজির করেনি। রাষ্ট্রের উদ্ভব, প্রকৃতি বা কাজ সম্পর্কে কোনও তাত্ত্বিক আলোচনার পরিবর্তে বাস্তবে রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়াই এ গ্রন্থের লক্ষ্য; প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের উদ্ভব, রাষ্ট্রকে মেনে চলার কারণ, ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের কার্যাবলী প্রভৃতি বিষয়গুলি অসংলগ্নভাবে আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন অধ্যায়ে। এভাবেই রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রের ধারণাটি পাই কৌটিল্যের মুখ থেকে নয়---রাজার প্রতি প্রজাদের আনুগত্যের স্বরূপ জানার জন্য 'সত্রি' নামক গুপ্তচরদের মাধ্যমে উপস্থাপিত বক্তব্যে। প্রজারা রাজানুরক্ত না রাজবিরোধী তা জানার জন্য রাজা গুপ্তচর নিয়োগ করবেন। এই সমস্ত গুপ্তচর তীর্থস্থান, সভাঘর, খাদ্য ও পানীয়স্থান, দোকান, পূজা ও দলবদ্ধ কর্মীদের মাঝে পরস্পরের মধ্যে সাজানো মিথ্যা ঝগড়া করবেন এবং প্রজাদের মনোভাব বুঝবেন। এইরকম এক ঝগড়ার বক্তব্য হিসেবে রাষ্ট্র সৃষ্টি সম্পর্কে বক্তব্যটি হাজির হয়েছে; কৌটিল্যের নিজস্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ তত্ত্ব হিসেবে নয়। সম্ভবত কৌটিল্য এভাবে সে সময়ের জনশ্রুতিকেই তুলে ধরেছেন।

অর্থশাস্ত্রের প্রথম অধিকরণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে বিবরণ রয়েছে তা থেকে রাষ্ট্রের তথা রাজতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ জানা যায়। কৌটিল্যের কাছে রাজতন্ত্রই যেহেতু স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান তাই রাষ্ট্রের এবং রাজতন্ত্রের উদ্ভব সমার্থক। রাষ্ট্রের উদ্ভবের আগে ছিল এক 'মাৎসন্যায়' অবস্থা। মাৎসন্যায় বলতে বোঝায় এমন এক অবস্থা যেখানে বড় বড় মাছ ছোট ছোট মাছকে গিলে নেয় অতি সাধারণভাবে। ঠিক সেভাবেই এক অরাজক অবস্থায় শক্তিশালী মানুষেরা দূর্বল মানুষের উপর অত্যাচার করে। এরকম অবস্থায় মানুষের পক্ষে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব নয়। তাই তারা বৈবসত মনুকে নিজেদের রাজা করেছিল এবং তারা এরকম নিয়ম করেছিল যে রাজা তাদের কাছ থেকে উৎপাদিত ধানের ছয় ভাগের এক ভাগ ও বিক্রয় যোগ্য দ্রব্যের (পণ্যের) দশ ভাগের এক ভাগ এবং হিরণ্য বা নগদ টাকা কর বাবদ পাবেন। এই করের বিনিময়ে রাজা প্রজাদের নিরাপত্তা ও মঙ্গল (যোগক্ষেম) এর ব্যবস্থা করবেন। এই কর রক্ষা কাজের জন্য রাজার প্রাপ্য বলে বনের ঋষিরাও তাঁদের সংগৃহীত ধান্যাদি থেকে ছয়ভাগের এক ভাগ রাজাকে দেবেন। রাজা যেহেতু প্রজাদের নিরাপত্তা বিধান ও দুষ্টের দমন করে থাকেন সেহেতু প্রজাদের উচিত তাদের উপর চাপানো কর এবং দণ্ড মেনে নেওয়া নতুবা তারা পাপের ভাগী হয়।

উপরের বক্তব্যের মধ্যে পশ্চিমী রাষ্ট্রতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিগণ---টমাস হবস (খ্রী: ১৫৮৮-১৬৭৯) জন লক (খ্রী: ১৬৩২-১৭০৪) বা রুশোর (খ্রী: ১৭১২-১৭৭৮) সামাজিক চুক্তি মতবাদের সুর হয়ত শুনতে পাবেন। রাষ্ট্র সৃষ্টির আগের অবস্থাকে টমাস হবস ঘৃণ্য পাশবিক, কদর্য ও স্পল্পায়ু হিসেবে বর্ণনা করেন। প্রাকৃতিক এই ভয়ঙ্কর 'জোর যার মুলুক তার' অবস্থার সঙ্গে মাৎসন্যায় অবস্থার মিল রয়েছে যথেষ্ট। হবস এর মতে, এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক সার্বভৌমের হাতে তুলে দেয়। ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা মেনে চলবে নতুবা তাদের পুনরায় সেই প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। চুক্তির শর্ত যেহেতু এক পক্ষের, অর্থাৎ রাজা বা সার্বভৌম

এই চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় সেহেতু সার্বভৌমের ক্ষমতা চূড়ান্ত, অপ্রতিহত ও অবিভাজ্য। এভাবে ষোড়শ শতকে চুক্তিবাদী তাত্ত্বিক টমাস হবস রাষ্ট্রের উদ্ভব ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে এক সুশৃঙ্খল তত্ত্ব রচনা করেন। এই তত্ত্ব রচনার দু'হাজার বছর আগে ভারতে কৌটিল্য রাষ্ট্রের উদ্ভবের পিছনে অনুরূপ এক তত্ত্বের সন্ধান করেন। সমসাময়িক গ্রীক দর্শনেও অবশ্য এরকম এক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। কৌটিল্যের মাৎসন্যায় এবং হবস এর প্রকৃতি-রাজ্যের রূপ একই---উভয়ই প্রাক্ সামাজিক অবস্থা। এই প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই রাষ্ট্র তথা রাজার সৃষ্টি। কিন্তু কৌটিল্যের কাছে আনুগত্যের প্রশ্নটি হ'ল কর প্রদানের অনুমতি---উৎপাদিত ফসল, পণ্য ও অর্থের নির্দিষ্ট পরিমাণ সংগ্রহের অনুমতি। ইংলণ্ডে সদ্য উদ্ভূত পুঁজিপতি শ্রেণীর ভাষ্যকার টমাস হবস এর কাছে এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়নি; অথচ, কৌটিল্য যথার্থভাবেই মনে করেন----রাষ্ট্র সৃষ্টির পিছনে উদ্বৃত্ত শ্রমের ধারণা বর্তমান। কৃষিভিত্তিক সমাজের এই উদ্বৃত্ত শ্রম কৃষকের ফসলের একাংশ রাজার প্রাপ্য। এভাবে কৃষিভিত্তিক সমাজের উদ্বৃত্ত শ্রম থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। এদিক থেকে কৌটিল্যের তত্ত্ব অনেক বেশী বাস্তবানুগ। অর্থশাস্ত্রে উত্থাপিত এই ধারণা আরো ব্যাপকভাবে এবং বহু জায়গায় আলোচিত হয়েছে মহাভারতের মধ্যে।

৩৩.৩.১ রাষ্ট্রের প্রকৃতি

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখেছি রাজা প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহের বিনিময়ে প্রজাদের নিরাপত্তা ও মঙ্গল বিধান করবেন। নিরাপত্তা ও মঙ্গল বিধানের জন্য রাজা কখনও প্রজাদিগকে অনুগ্রহ কখনও নিগ্রহ করে থাকেন। এ কারণে রাজাকে ইন্দ্র ও যম স্থানীয় বলে কল্পনা করা হয়েছে। কোনও প্রজার পক্ষেই রাজাকে অপমান করা বা অমান্য করা উচিত নয়। বলা হয়েছে যে, রাজাকে যে অমান্য করে তাকে শুধু রাজদণ্ড নয়, দৈবদণ্ডও স্পর্শ করে।

দ্বিতীয়ত, প্রথম রাজা হিসেবেই মনুকে উল্লেখ করা হয়েছে। মনু হ'লেন বিশশ্বতের পুত্র। সূর্যের আবার অপর নাম বিশশ্বত। এদিক থেকে সূর্যের পুত্র হিসেবে মনুকে প্রথম রাজা হিসেবে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে সমগ্র সৌরজগতের মধ্যমণি রূপে রাজতন্ত্রকে গণ্য করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, এই জগতের রাজতন্ত্রের সঙ্গে ঐশ্বরিক জগতের রাজতন্ত্রের এক সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজার অবস্থান ঐশ্বরিক জগতের ইন্দ্র ও যমের অনুরূপ; কারণ ইন্দ্রের মতো তিনি যেমন করুণা প্রদর্শন করেন তেমনই যমের মতো দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করে থাকেন।

চতুর্থত, কৌটিল্যের রাজা অনিয়ন্ত্রিত, অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী নন; কারণ, মানুষ রাজার হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেছে তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। প্রথম অধিকরণের ১৯তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, প্রজার সুখেই রাজার সুখ এবং প্রজার হিতেই রাজার হিত; যা রাজার প্রিয় তা রাজার হিত নয়। কিন্তু প্রজাদিগের যেটা প্রিয় সেটাই রাজার হিত। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে রাজার কর্তৃত্বকে যতটা অধিকার হিসেবে দেখা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী দায়িত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজার ক্ষমতাকে অপ্রতিহত করার পরিবর্তে অছি স্বরূপ দেখা হয়েছে। যোগক্ষেম বহন, চতুর্বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষা প্রভৃতি দায়িত্বপালনের জন্যই রাজতন্ত্র বা রাষ্ট্রকর্তৃত্বকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হ'তে পারে যাঁরা নাতিশাস্ত্রগুলি রচনা

করেছেন বা ব্যাখ্যা করেছেন তাঁরা ব্রাহ্মণ, তাঁরা উদ্বৃত্তের উপর জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। রাজার পক্ষে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের কথা বলে তাঁরা রাজতন্ত্রকে সংযত করতে চেয়েছেন।

উপরের আলোচনা থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্তে আসা ভুল হবে যে, কৌটিল্য এক ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রের রূপাঙ্কণ করেছেন। তিনি অর্থশাস্ত্রে কোন ধর্মীয় সংগঠন বা সংস্থার উল্লেখ করেননি - যে সংস্থা রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে এবং ধর্মীয় স্বার্থ বা অনুশাসনগুলি বলবৎ করবে। তিনি সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে সমর্থন করে গেছেন। রাষ্ট্র কীভাবে শক্তিশালী হবে এবং রাষ্ট্রের প্রসার ঘটাবে সে বিষয়ে আলোচনাই কৌটিল্যের অন্যতম লক্ষ্য।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রকর্তৃত্বের প্রতীক হিসেবে কৌটিল্য দণ্ড-এর উল্লেখ করেন। দণ্ডের মাধ্যমেই প্রজাদের পালন ও রাষ্ট্রকর্তৃত্বের প্রয়োগ ঘটে। এই দণ্ডনীতিই অলব্ধ বস্তুকে লাভ করায়, লব্ধবস্তুকে রক্ষা করায়, রক্ষিত বস্তুকে বর্ধিত করায় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বস্তুকে উপযুক্ত পাত্রে বিনিযুক্ত করায়। এই দণ্ডের অভাবেই মাৎসন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কৌটিল্য দণ্ডকে এত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করলেও দণ্ডের প্রয়োগ সম্পর্কে রাজাকে যথেষ্ট সর্তক হ'তে বলেন। দণ্ডের প্রয়োগ হবে শুধুমাত্র প্রজাদের হিতসাধনের জন্য; অনিষ্ট করার জন্য নয়। কৌটিল্যের মতে, যিনি অল্প অপরাধে উগ্রদন্ড প্রয়োগ করেন তিনি সকলের উদ্বেগের কারণ হন। আবার যে রাজা মহা অপরাধে মৃদু দণ্ড প্রয়োগ করেন তিনি স্বয়ং পরাভব প্রাপ্ত হন। কিন্তু যে রাজা অপরাধের অনুরূপ উচিত দণ্ড প্রয়োগ করেন তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হন। "কাম ক্রোধ বা অজ্ঞতাবশত যে দণ্ড অযথা প্রযুক্ত হয় তা বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজকদেরও কোপ উৎপাদন করে, গৃহস্থের তো কথাই নাই।'

ষষ্ঠত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যেহেতু রাজাই প্রধান সেহেতু ইউ.এন. ঘোষাল এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্র এবং রাজা তথা স্বামী সমার্থক। কাঙলে অবশ্য এই মতকে পুরোপুরি স্বীকার করতে নারাজ। কাঙলের মতে, কৌটিল্য বর্ণিত রাষ্ট্রের ব্যয়ের তালিকার (ব্যয় শরীর ২.৬.১১) ১৫টি বিষয়ের (রাধাগোবিন্দ বসাকের হিসেবে ২৪টি) মধ্যে প্রথম চারটি বিষয় রাজার ব্যক্তিগত ব্যয় সম্পর্কিত; বাকি বিষয়গুলি রাষ্ট্র সম্পর্কিত। তাছাড়া, রাজা স্বয়ং, তাঁর পত্নীগণ ও রাজপুত্ররা কী রত্ন ও ভূমি লাভ করছেন তার হিসেব রাষ্ট্রের নিবন্ধপুস্তকে লিপিবদ্ধ করাবেন। এর থেকে মনে হয় রাজা এবং রাষ্ট্র সমার্থক নয়।

সপ্তমত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের তিন ধরনের শক্তি তথা ক্ষমতার উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা, উৎসাহশক্তি অর্থাৎ রাজার উৎসাহ ও ব্যক্তিগত গুণাবলী, শৌর্য বীর্য ইত্যাদি। প্রভাবশক্তি অর্থাৎ কোশ (অর্থ) ও দণ্ড (সেনা) এবং মন্ত্রশক্তি তথা মন্ত্রণাশক্তি। কৌটিল্যের সময়ের অন্যান্য পণ্ডিতদের মত ছিল এই তিনশক্তির মধ্যে প্রথমটি; অর্থাৎ রাজার উৎসাহ এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীই প্রধান; কারণ, শৌর্য-বীর্যের অধিকারী দৈহিক বলসম্পন্ন ও অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ রাজার পক্ষে অন্য রাজ্যকে পরাস্ত করা সম্ভবপর হয়। কৌটিল্যের মতে উৎসাহশক্তি এবং প্রভাবশক্তির (কোষ ও সেনা) মধ্যে প্রভাবশক্তিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অর্থ ও সেনায় সমৃদ্ধ রাজা শত্রুপক্ষের বীরদেরকেও প্রচুর ধনদানের মাধ্যমে বশ করতে পারেন এবং নিজ সেনার সাহায্যে অপর পক্ষকে পরাজিত করতে পারেন। অনুরূপভাবে বলা যায়, প্রভাবশক্তি ও মন্ত্রশক্তির মধ্যে মন্ত্রশক্তিই প্রধান, কারণ প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন রাজা অনায়াসেই মন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত সিদ্ধান্ত

দ্বারা উৎসাহ ও প্রভাবশক্তি সম্পন্ন শত্রুরাজগণকে পরাভূত করতে পারেন। আবার শক্তি দেশ ও কালের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কেও অন্যান্য পণ্ডিতদের মত খণ্ডন করে কৌটিল্য বলেন, শক্তি, দেশ ও কাল—এই তিনের প্রত্যেকটিকেই সমান প্রাধান্য দিতে হবে; কারণ, তিনটিই কার্যসাধন বিষয়ে একে অপরের পরিপূরক।

৩৩.৩.২ রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ

রাষ্ট্রের প্রকৃতি আলোচনার সময় আমরা দেখেছি, রাজতন্ত্রই কৌটিল্যের কাছে স্বাভাবিক শাসনব্যবস্থা। রাজা বাছাই-এর ব্যাপারে বৈদিক সূত্রে যে রত্নিন, সভা, সমিতির উল্লেখ পাওয়া যায় অর্থশাস্ত্রে তার কোনও উল্লেখ নেই। সম্ভবত কৌটিল্যের সময়ে রাজতন্ত্র বৈদিক যুগের তুলনায় অনেক বেশী দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ শাস্ত্র সমূহেও রাজতন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই কৌটিল্যের আলোচনাতে রাজতন্ত্রই কাম্য শাসনব্যবস্থা।

অর্থশাস্ত্রে রাজতন্ত্র ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের শাসনব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। অষ্টম অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বৈরাজ্য এবং বৈরাজ্য—এই দু'ধরনের শাসনব্যবস্থাকে রাজতন্ত্রেরই ব্যাধি বা বিচ্যুতি জনিত শাসনব্যবস্থা হিসেবে কৌটিল্য উল্লেখ করেন। দ্বৈরাজ্য বলতে রাজ্যের বিভাজন বা দুই রাজ্যের উপস্থিতি নয়। দ্বৈরাজ্য বলতে কৌটিল্য বুঝিয়েছেন একই রাজ্যে দুই শাসকের উপস্থিতি, যেমন শাসক হিসেবে পিতা পুত্র বা দুই ভাই এর উপস্থিতি। পিতা-পুত্র বা দুই ভাই এর মধ্যে বিরোধের কারণে দ্বৈরাজ্য গড়ে ওঠে।

বৈরাজ্য হ'ল বিদেশীশাসক কর্তৃক কোনও রাজ্যের শাসন। কোনও বিদেশী রাজা ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে কোনও রাজ্য অধিকার করে সেই রাজ্যের শাসককে সরিয়ে যখন নিজে শাসন ক্ষমতা দখল করে তখন সেই পরাধীন রাজ্যকে বলা হয় বৈরাজ্য। কে. পি. জয়সওয়াল বৈরাজ্য শব্দটিকে রাজাশূন্য বা রাজাবিহীন রাজ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। অপরদিকে, এইচ. কে. দেব শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন অভিজাততন্ত্র হিসেবে। এই উভয় ব্যাখ্যাকেই খণ্ডন করে কাঙলে দেখান যে, কৌটিল্য ব্যবহৃত বৈরাজ্য শব্দটির দ্বারা রাজাবিহীন বা অভিজাততন্ত্রের পরিবর্তে বিদেশী শাসক কর্তৃক অধিগৃহীত রাজ্যকে বোঝানো হয়েছে।

দ্বৈরাজ্য এবং বৈরাজ্যের মধ্যে কোন্‌টি কম ক্ষতিকারক সে সম্পর্কে কৌটিল্য আলোচনার সূত্রপাত করেন অষ্টম অধিকরণে। কৌটিল্যের সমসাময়িক পণ্ডিতদের মতে, বৈরাজ্য অপেক্ষা দ্বৈরাজ্য অধিকতর ক্ষতিকারক, কারণ দ্বৈরাজ্যে দুই রাজার উপস্থিতির জন্যে যদি উভয় রাজার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় তাহলে রাষ্ট্রেরও ক্ষতি হয়। কিন্তু বৈরাজ্য (যা অন্য রাজার বিজিত রাজ্য) প্রজাদের মন জয়ের জন্য চেষ্টা করে এবং জনকল্যাণকর হয়। কৌটিল্য এই মতের বিরোধিত করে বলেন, পিতা ও পুত্রের মধ্যে বা দুই ভাইএর মধ্যে বিরোধের ফলে দ্বৈরাজ্য সৃষ্টি হয় কিন্তু এই রাজ্য সমান যোগক্ষেম বিশিষ্ট থাকে বলে অমাত্যগণ অধীন থাকে। কিন্তু বৈরাজ্যে বিজয়ী রাজা অপরের রাজ্য দখল করে 'এ রাজ্য তো আসলে আমার নয়' এরূপ মনে করে দণ্ড ও কর স্থাপন করে প্রজাদের কষ্টের কারণ হয়; অথবা অন্য রাজার কাছে অর্থের বিনিময়ে রাজ্য বিক্রয় করে অথবা প্রজারা বিরক্ত বুঝতে পারলে সে রাজ্য ত্যাগ করে। এককথায় বৈরাজ্যের রাজা নিজের রাজ্য হিসেবে প্রজাদের মঙ্গল করেন না। এ কারণেই কৌটিল্য দ্বৈরাজ্য অপেক্ষা বৈরাজ্যকে বেশি ক্ষতিকারক বলে মনে করেন।

'কুল' বা 'কুল সংঘ' দ্বারা পরিচালিত আর এক ধরনের রাষ্ট্রের উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে রয়েছে। যখন কোনও রাজার উত্তরাধিকারী নিয়ে সংশয় বা অসুবিধে (যেমন নাবালকত্ব বা অযোগ্যতাজনিত কারণে) দেখা দেয় তখন রাষ্ট্র পরিচালিত হয় 'কুল সংঘ' দ্বারা (১.১৭)। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক-এর মতে, এখানে 'কুল' শব্দের দ্বারা রাজার বহু পুত্রসংঘকে বা পুত্র না থাকলে কুলবৃদ্ধদেরকে বোঝানো হয়েছে। কৌটিল্যের মতে, এই ধরনের কুলসংঘ অত্যন্ত শক্তিশালী হয় এবং প্রজাপীড়ন না করে অনেকদিন রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে থাকে (১.১৭)। কিন্তু অষ্টম অধিকরণের তৃতীয় অধ্যায়ে সংঘ সমূহের কুফল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এ ধরনের শাসনে পরস্পরের মধ্যে ভেদ উপস্থিত হয় এবং এর ফলে রাষ্ট্রের বিনাশ ঘটে।

একাদশ অধিকরণে কুলসংঘ ছাড়াও আর এক ধরনের সংঘ শাসনের কথা বলা হয়েছে। এই শাসন হল 'সংঘবৃত্ত' এর শাসন। এই বিষয়টি উপস্থাপনের উদ্দেশ্য হ'ল কিভাবে বিজিগীষু (বিজয়ে ইচ্ছুক) রাজা সংঘকে সহায়করূপে পেতে পারে তা দেখানো। কৌটিল্যের মতে, সংহত বা একত্রভাবে শক্তি সম্পন্ন হয়ে অবস্থিত সংঘসমূহ শত্রুগণের দ্বারা পরাজিত হয় না। একারণে সংঘকে সহায়ক হিসেবে পাওয়া গেলে বিজিগীষু রাজার পক্ষে সেই লাভ দণ্ড বা সৈন্য বা মিত্রলাভ অপেক্ষা অধিকতর কাম্য। সুতরাং, বিজিগীষু রাজা সংঘসমূহকে সাম ও দান প্রয়োগ করে নিজের আয়ত্বে রাখবেন এবং প্রতিকূল হ'লে সংঘসমূহকে ভেদ ও দণ্ড প্রয়োগ করে শাসনে রাখবেন।

সংঘগঠনের ধরন সম্পর্কে কোনও বিস্তারিত আলোচনা অর্থশাস্ত্রে নেই। অবশ্য একাদশ অধিকরণে দু'ধরনের সংঘের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। এক ধরনের সংঘ হ'ল কৃষি, পশুপালন অথবা বাণিজ্য যাদের জীবিকা কিন্তু প্রয়োজনে অস্ত্র ধরতেও সক্ষম এরকম লোকদের নিয়ে সংঘ। এই ধরনের সংঘকে বলা হয়েছে বার্ত্তাশস্ত্রোপজীবিন। এই ধরনের সংঘের উদাহরণ হ'ল কম্বোজ ও সুরাষ্ট্র দেশের সংঘ সমূহ। দ্বিতীয় ধরনের সংঘকে বলা হয় রাজশব্দোপজীবিন, অর্থাৎ রাজার উপাধি বা পদের দ্বারা যারা জীবিকা নির্বাহ করেন। সম্ভবত এ ধরনের সংঘ শাসনে শাসকগোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত সকলেই রাজা বলে পরিচিত হন। লিচ্ছিবিক (যাদের প্রাচীন রাজধানী ছিল বৈশালী) ব্রজিক (পালিতে বজ্জিক) মল্লক (প্রাচীন রাজধানী পাবা) মদ্রক, কুকুর, কুরু ও পাঞ্চালদেশীয় শ্রেণী বা সংঘীরা রাজনামধারী সংঘোপজীবী। এই উভয় ধরনের সংঘেই একাধিক শাসক থাকেন। এ কারণে বিজিগীষু রাজা কীভাবে সংঘ শাসকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সংঘকে অনুকূলে নিয়ে আসবেন সেই বিষয়ে আলোচনাই স্থান পেয়েছে একাদশ অধ্যায়ে। অবশ্য, এই অধিকরণেরই শেষ সূত্রে কৌটিল্য পরামর্শ দিয়েছেন কীভাবে সংঘ এই ভেদবুদ্ধি অতিক্রম করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবে। বলা হয়েছে, সংঘগুলি রাজার ভেদবুদ্ধি সম্পর্কে যথেষ্ট সর্তক থাকবে। সংঘমুখ্য ন্যায় অনুসারে সকলের হিতকারী ও প্রিয় হয়ে সংঘ-মধ্যে অনুদ্ধত থাকবেন এবং নিজ চিন্তার কাছাকাছি জনসমূহকে নিজের কাছে রেখে সংঘের সব মানুষের মতানুবর্তী হয়ে থাকবেন। এই সাবধানবাণী থেকে মনে হয়, কৌটিল্য পুরোপুরি সংঘ শাসনের বিরোধী ছিলেন না। সংঘ প্রধানগণ কীভাবে সংঘ-মধ্যে প্রধান স্থান দখল করেন সে সম্পর্কে অবশ্য কোনও উল্লেখ নেই। কাঙলে মনে করেন, সম্ভবত প্রধানগণ কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিবার থেকেই বাছাই হতেন। গোড়ার দিকে সম্ভবত বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রধানগণ মিলিত হয়ে এই সংঘ পরিচালনা করতেন।

৩৩.৪ সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব—রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান

প্রাক্ বৈদিক বা বৈদিক যুগে রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট এবং সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত এ সময় পর্যন্ত রাষ্ট্র সমাজজীবনে দৃঢ়মূল হয়ে ওঠেনি। ধর্মসূত্রে রাজা, অমাত্য প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার থাকলেও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাষ্ট্রের বিষয়টি আলোচিত হয়নি। কিন্তু বেদ পরবর্তীযুগে ক্রমশ নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকাযুক্ত এবং সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আমরা ষোড়শ মহাজনপদের পরিচয় পাই বুদ্ধের সময় কোশল ও মগধ রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ঘটে। রাষ্ট্রের এই বিকাশ চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। এসময়কার কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমরা প্রথম রাষ্ট্র সম্পর্কে এক সুসংবদ্ধ ও গভীর আলোচনা লক্ষ্য করি।

অর্থশাস্ত্রের 'মণ্ডলযোনি' নামক ষষ্ঠ অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে কৌটিল্য রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের কথা বলেন—'স্বাম্যমাত্যজনপদ, দূর্গ, কোশ, দণ্ড, মিত্রানি প্রকৃতয়ঃ'। কৌটিল্যের এই বক্তব্যে রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান বা অঙ্গের পরিচয় আমরা পাই। যেমন স্বামী, অমাত্য, জনপদ, দূর্গ, কোষ দণ্ড এবং মিত্র। কৌটিল্য অবশ্য উপাদানের পরিবর্তে প্রকৃতি শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কারণ এই উপাদানগুলি পরস্পরের প্রকৃষ্টভাবে উপকার সাধক বলে এদের নাম প্রকৃতি। অষ্টম অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায় সপ্ত প্রকৃতিকে কৌটিল্য দু'টি বর্গে ভাগ করেন, যথা রাজা এবং রাজ্য। কৌটিল্যের সময়কার বা তার পরের অন্যান্য গ্রন্থেও যেমন মনুশ্রুতি, অগ্নিপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এই সাতটি উপাদানের উল্লেখ রয়েছে; এ কারণে বিষয়টিকে রাষ্ট্রসম্পর্কে সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব নামেও উল্লেখ করা হয়। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে রচিত বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে স্বামী এবং অমাত্যের পরিবর্তে সাম এবং দান শব্দ দু'টির উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে রাষ্ট্রের আটটি অঙ্গের (অষ্টাঙ্গিক রাজ্য) কথা বলা হয়েছে এবং অষ্টম অঙ্গ হিসেবে পুরশ্রেণীর উল্লেখ রয়েছে। আমরা এখানে রাষ্ট্রের এই সাতটি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করব।

৩৩.৪.১ স্বামী

রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান উপাদান হিসেবে স্বামীর উল্লেখ করা হয়েছে। রাজা বা শাসক এর পরিবর্তে স্বামী শব্দটি ব্যবহার এর মধ্য দিয়ে কৌটিল্য সম্ভবত প্রধান বা প্রভু অর্থেই ব্যবহার করেছেন। কৌটিল্য স্বামীর কতকগুলি গুণের কথা বলেছেন, যেমন বংশগতগুণ, প্রজ্ঞাগুণ, উৎসাহগুণ এবং আত্মগুণ। বংশগত গুণের কথা বলে কৌটিল্য সম্ভবত রাজতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্রকেই সমর্থন করেছেন। কৌটিল্যের আলোচনায় স্বামীর ক্ষমতার চেয়ে দায়িত্ব এবং কর্তব্যের বিষয়টিই প্রধান স্থান পেয়েছে। এ বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

৩৩.৪.২ অমাত্য

অমাত্য শব্দটির ব্যবহার অর্থশাস্ত্রে এবং সে সময়ের অন্যান্য গ্রন্থেও লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে অমাত্য বলতে মন্ত্রীকেই বোঝায়। কিন্তু প্রাচীনকালে সম্ভবত অমাত্য ও মন্ত্রীদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। মন্ত্রী বলতে বোঝায় অল্পসংখ্যক ব্যক্তি অপরদিকে অমাত্য বলতে অনেক ব্যক্তিকে—উভয়েই অবশ্য পরামর্শদানে বা রাজ্যের কার্যপরিচালনায় রাজার সহায়ক। মহাভারতের শান্তিপর্বে যেখানে অমাত্যের সংখ্যা ৩৭, মন্ত্রীর

সংখ্যা সেখানে মাত্র ৮জন ঠিক করা হয়েছে---যদিও এই সংখ্যা মহাভারতে সবজায়গায় একই বলা নেই। অর্থশাস্ত্রে অমাত্য বলতে বোঝানো হয়েছে স্থায়ী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ, যেমন প্রধান পুরোহিত, মন্ত্রীগণ, রাজস্ব সচিব, কোষাধ্যক্ষ, দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিষয়ক প্রশাসক, অন্তঃপুররক্ষক এবং বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ। অপরদিকে, মন্ত্রীগণ শুধুমাত্র রাজাকে মন্ত্রণাদানে যুক্ত থাকতেন। স্বাভাবিকভাবেই কৌটিল্য মন্ত্রীদের সংখ্যা তিন থেকে চার এর মধ্যে সীমিত রাখতে চেয়েছেন। অপরদিকে, অমাত্যগণের সংখ্যা নির্দিষ্টকরণের পরিবর্তে প্রয়োজন ও সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে চেয়েছেন।

পালিগ্রন্থেও অমক্ক শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে এবং বলা বাহুল্য, কৌটিল্যের অমাত্য এবং পালি গ্রন্থে অমক্ক একই অর্থবহ। জাতক গ্রন্থে শতাধিক অমাত্য নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে যেখানে অমাত্যগণ গ্রামের প্রধান, লবণ ক্রয়-বিক্রয়ের তত্ত্বাবধায়ক, বিচারক, জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের পথ প্রদর্শক এবং জরিপবিদ হিসেবে কাজ পরিচালনা করেন। রামশরণ শর্মার মতে, প্রথমদিকে অমাত্যগণ ছিলেন স্বামীর তথা রাজার বন্ধু, সহচর পার্ষদ কিন্তু পরবর্তীকালে, বিশেষ করে মৌর্যযুগে, অমাত্যগণ রাজার কর্মচারীতে পরিণত হন। জাতক বর্ণিত অমাত্যদের মতো কৌটিল্য কথিত অমাত্যগণও কৃষিপরিদর্শন, দূর্গরক্ষা, জনপদের কল্যাণ, দুর্যোগ প্রতিরোধ, রাজস্ব সংগ্রহ, দোষী বক্তির শাস্তিবিধান প্রভৃতি কাজগুলি সম্পাদন করেন। এককথায়, অমাত্যগণ সরকারী যন্ত্র স্বরূপ। মৌর্য পরবর্তী যুগে অমাত্য শব্দের পরিবর্তে সচিব শব্দটির ব্যবহার ঘটতে থাকে। রুদ্রদামন লিপিতে মতি সচিব এবং কর্মসচিব শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

কৌটিল্য অমাত্যদের যোগ্যতার প্রসঙ্গে পঁচিশটি গুণ সম্পদের এক বিশাল তালিকা পেশ করেছেন; যেমন, স্বদেশীয়, উচ্চবংশজাত, বিভিন্ন কলায় পারদর্শী, বাগ্মী, সহনশীল, সচ্চরিত্রসম্পন্ন ইত্যাদি। এই সমস্ত গুণগুলি যে অমাত্যের মধ্যে রয়েছে তিনি উত্তম শ্রেণীর অমাত্য। গুণগুলির চারভাগের একভাগ যার নেই তিনি মধ্যম শ্রেণীর অমাত্য এবং যার এই গুণগুলির অর্ধেকও নেই তিনি অধম শ্রেণীর অমাত্য। অমাত্যদের গুণ এবং তাদের কাজের ধরন ও গতিবিধি সম্পর্কে রাজা সবসময় অবহিত হবেন গুপ্তচরের মাধ্যমে।

কৌটিল্যের কাছে মন্ত্রীগণ-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রীগণ রাজার মন্ত্রণাদাতা; রাষ্ট্রের তিনশক্তির মধ্যে মন্ত্রণাশক্তিই প্রধান। নীতি নির্ধারণ করা, আর্থিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা—সব ব্যাপারেই রাজার উচিত যোগ্য মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করা।

৩৩.৪.৩ জনপদ

রাষ্ট্রের তৃতীয় উপাদানটি হ'ল জনপদ। প্রাচীনযুগে রাষ্ট্র শব্দটির পরিবর্তে জনপদ শব্দটির প্রচলন ছিল বেশী। মনুস্মৃতি, বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের শান্তিপর্বে সপ্তাঙ্গ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জনপদ শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। কামন্দকীয় নীতিসারে রাষ্ট্রশব্দটির মাঝে মাঝে ব্যবহার ঘটেছে, আবার গুপ্তযুগে, যেমন যাজ্ঞবল্ক্যসূত্রে, শুধুমাত্র 'জন' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে.

পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রতত্ত্বে রাষ্ট্রের উপাদান হিসেবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের কথা বলা হয়েছে এবং জনসংখ্যাকে অপর একটি উপাদান ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে, যেমন অর্থশাস্ত্রে, জনপদ শব্দটির মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং জনসংখ্যা এই দু'টি উপদানকে একসঙ্গে বোঝানো হয়েছে। তাছাড়া, ভূখণ্ড বলতে এখানে

শুধুমাত্র জমি নয়; সুন্দর আবহাওয়াযুক্ত গোচারণ ও সমৃদ্ধ কৃষিযোগ্য জমিকেই ধরা হয়েছে। এখানে থাকবে পরিশ্রমী কৃষক যারা কর এবং শান্তিবহনে সক্ষম। জনসংখ্যার মধ্যে একদিকে থাকবে অল্পসংখ্যার জ্ঞানবান প্রভু এবং বহু সংখ্যায় নিম্নজাতভুক্ত ব্যক্তি যারা প্রকৃতিতে হবে অনুগত। অর্থশাস্ত্রে জনসংখ্যার সঠিক সংখ্যার উল্লেখ না থাকলেও নতুন জনপদ গঠনের ক্ষেত্রে কৌটিল্য বলেন, প্রতিটি গ্রাম গড়ে উঠবে এক থেকে পাঁচশত পরিবার নিয়ে এবং স্থানিক এবং জনপদের সবচেয়ে বড় একক গড়ে উঠবে আটশত গ্রাম নিয়ে। কামন্দক আরো স্পষ্টভাবে বলেন, জনসংখ্যার মধ্যে থাকবে শূদ্র, কারিগর, ব্যবসায়ী এবং পরিশ্রমী উদ্যোগী কৃষক। গুপ্তযুগের বিভিন্ন পুরাণেও জনসংখ্যার প্রকৃতি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে, যেমন মৎসপুরাণে বলা হয়েছে রাজা এমন এক দেশে বাস করবেন যেখানে বৈশ্য এবং শূদ্রদের আধিক্য থাকবে; থাকবে অল্পসংখ্যায় ব্রাহ্মণ, অধিক পরিমাণে ভাড়াটে শ্রমিক।

আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, প্রাতটি শাস্ত্রেই জনসংখ্যার মধ্যে অধিক পরিমাণে পরিশ্রমী ও উদ্যোগী জনের থাকার কথা বলা হয়েছে। আসলে এ সময় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কৃষিব্যবস্থা ক্রমশ স্থায়ী এবং সমৃদ্ধ হ'তে থাকে। উদ্বৃত্ত ফসলকে কেন্দ্র করেই ক্রমশ রাষ্ট্রের ও তার সরকারী ব্যবস্থাপনার প্রসার ঘটে। একে কেন্দ্র করেই সমাজে প্রাধান্য স্থাপনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। গড়ে উঠতে থাকে এক নতুন সামাজিক বিন্যাস যা বর্ণভিত্তিক এবং পরে জাতভিত্তিক স্তর-বিন্যাসের রূপ নেয়। এই স্তর-বিন্যাসে প্রভু এবং ব্রাহ্মণ উচ্চজাতভুক্ত, কায়িক শ্রম থেকে মুক্ত, উদ্বৃত্তের উপর নির্ভরশীল, যাদের সংখ্যাও তুলনায় কম। অপরদিকে, কায়িক শ্রমজীবি ব্যাপক মানুষ যারা কৃষক, কারিগর, ভাড়াটে শ্রমিক নামে পরিচিত। এর মাঝে রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এক বিশাল কর্মীবাহিনী ও সেনাবাহিনী। এই সব নিয়েই কৌটিল্যের জনপদ।

৩৩.৪.৪ দুর্গ

রাষ্ট্রের চতুর্থ উপাদানটিকে কৌটিল্য দুর্গ বলে উল্লেখ করেন। মনুসংহিতায় অবশ্য দুর্গের পরিবর্তে পুর শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে রাষ্ট্রের তৃতীয় উপাদান হিসেবে। সাধারণত দুর্গ বলতে গড়, কেল্লা বোঝায়। কিন্তু এখানে দুর্গ শব্দটির দ্বারা রাজধানী, নগর, দুর্গকে বোঝানো হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে দুর্গবিধান এবং দুর্গনিবেশ---এই দু'টি শব্দেরও উল্লেখ রয়েছে। প্রথমটির মধ্যে দুর্গের গঠন এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে রাজধানীর পরিকল্পনা ও নকশা সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে জনপদ এবং পুর এই দু'টি শব্দের পার্থক্য করে বলা হয়েছে, জনপদ বলতে গোটা রাজ্য এবং পুর বলতে রাজধানী বোঝায়। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচর্চায় রাষ্ট্রের উপাদান হিসেবে দুর্গের উল্লেখ না থাকলেও গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল (Aristotle, 384-322 B.C.) 'Politics' গ্রন্থে রাষ্ট্রের মধ্যে রাজধানীর অবস্থান কোথায় হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। আরিস্টটলের মতো কৌটিল্যও মনে করেন, রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে রাজধানী স্থাপিত হবে, বিভিন্ন জাতগোষ্ঠী এবং কারিগর, এমনকি দেবদেবীদের মন্দিরও, সুনির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক স্থানে গড়ে উঠবে। রাজধানীতে বিভিন্ন ধরনের কারিগরের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ, সম্ভবত, একদিকে সামরিক ও কৃষির প্রয়োজনে কারিগর অপরিহার্য এবং দ্বিতীয়ত কারিগররা রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে রাজকোষকে স্ফীত করে তোলে। দুর্গের মধ্যে বিভি ন্ন ভেষজ দ্রব্য ও গাছগাছড়া যেমন থাকবে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যও মজুত থাকবে। বিভিন্ন

ধাতব পদার্থে সমৃদ্ধ থাকবে দূর্গ। দূর্গের গঠন ও জনবিন্যাসের এক বিস্তারিত বিবরণও দিয়েছেন কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে।

৩৩.৪.৫ কোষ

রাষ্ট্রের পঞ্চম উপাদান হিসেবে কৌটিল্য কোষ এর উল্লেখ করেন। রাজকোষ বা ধনভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রক হবেন রাজা স্বয়ং। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বৈধ এবং ন্যায়সম্মতভাবে ধনসম্পদ সংগ্রহ করা রাজার অন্যতম দায়িত্ব। এমনকি কোন্ কোন্ উৎস থেকে ধনসঞ্চয় হ'তে পারে কৌটিল্য তারও এক বিশদ তালিকা পেশ করেন। দূর্গ, জনপদ, খনি, বাড়ী ও উদ্যান, বন, পশু এবং বনিকপথ এই সাতটি উৎসের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়। যেমন, দূর্গের মধ্যেই রয়েছে পথশুল্ক, জরিমানা, বৃত্তিকর প্রভৃতি বিষয়। রাজকোষে সোনা, রূপা, মণিমুক্তা, অন্যান্য মূল্যবান ধাতু, খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদির সংগ্রহ এমন পর্যাপ্ত হবে যাতে যে কোন দুর্বিপাক, যেমন যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ঘটনার মোকাবিলা করা যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজার সংগৃহীত রাজঅন্তঃপুর ছাড়াও প্রশাসনিক ও সামরিক প্রয়োজনে রাজকোষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; নতুবা রাজকর্মচারী ও সামরিক বাহিনীকে অনুগত রাখা যাবে না। বস্তুত, রাষ্ট্রের যে কোনও কাজই যে রাজকোষের উপর নির্ভর করে তা কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের অষ্টম অধিকরণে প্রথম অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়ের তদারকি করার জন্য এক বিশাল কর্মচারী বাহিনীর কথাও কৌটিল্য বলেন। এই কর্মচারীদের প্রধান থাকবেন রাজার কাছে। রাজকোষ যাতে সুরক্ষিত থাকে, রাষ্ট্রীয় অর্থের যাতে অপচয় না হয়, কর্মচারীরা যাতে রাজকোষ অত্মস্যাৎ না করে তার জন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের তথা গুপ্তচরদের সাহায্য নেবেন।

৩৩.৪.৬ দণ্ড

দণ্ড হচ্ছে রাষ্ট্রের ষষ্ঠ উপাদান। দণ্ড শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হ'লেও রাষ্ট্রের উপাদান হিসেবে দণ্ড শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে সেনাবাহিনীকে বোঝাতে। কৌটিল্যের মতে, দণ্ডের মধ্যে বংশানুক্রমিক এবং ভাড়াটে এই দু'রকমের সৈনিকই থাকবে। সৈন্যবাহিনীতে পদাতিক, অশ্বারোহী, রথারোহী ও হস্তিবাহিনী থাকবে। বনাঞ্চল এবং অন্যান্য দুর্গম অঞ্চলের জন্য দক্ষ বাহিনী দরকার। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়কে সৈন্যবাহিনীর উপযুক্ত এবং যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের জাত-কাজ বলা হয়েছে। মনুসংহিতায় বা মহাভারতে অবশ্য রাষ্ট্রের আপৎকালীন অবস্থায় ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যকেও সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের কথা বলা হয়েছে। কৌটিল্য অবশ্য বৈশ্য ও শূদ্রকেও সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগের পক্ষপাতী। সম্ভবত কৌটিল্য যখন অর্থশাস্ত্র রচনা করেন তখনও জাত-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ কারনে বংশানুক্রমিক সৈনিকের কথা বললেও ভাড়াটে সৈনিকও কৌটিল্যের রচনায় স্থান পেয়েছে। সৈনিকের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, সৈনিক হবে দক্ষ, ধৈর্যবান, জয়পরাজয় সম্পর্কে বিগতমনা, রাজানুগত এবং রাজার আজ্ঞাবহ। সৈনিক ও তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রের হাতে।

৩৩.৪.৭ মিত্র

রাষ্ট্রের সপ্তম ও সর্বশেষ উপাদান হ'ল মিত্র যা অন্যান্য শাস্ত্রে সুহৃদ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কৌটিল্যের মতে, সৈনিকের মতো মিত্রও হবে বংশানুক্রমিক, প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্খী, যে কোনও বিপদে সাহায্যদানকারী। শঠতা, লোভ, মিথ্যা বলা, কৃত্রিমতা প্রভৃতি শত্রুর বৈশিষ্ট্য—মিত্রের নয়। বিদেশনীতির আলোচনায় কৌটিল্য সেই সমস্ত রাজাকে মিত্র হিসেবে গণ্য করেছেন যাঁরা বিজিগীষু রাজার সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়ে যুদ্ধে সহায়তা করেন। বিষয়টি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত ভাবে পরে আলোচনা করব।

৩৩.৪.৮ রাষ্ট্রের উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও আপেক্ষিক গুরুত্ব

রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদানগুলির উল্লেখের পর উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুরুত্ব সম্পর্কেও কৌটিল্য আলোচনা করেন। এ ব্যাপারে তিনি সে সময়কার অন্যান্য পণ্ডিতদের বক্তব্য তুলে ধরেন। ভরদ্বাজ রাষ্ট্রের উপাদানগুলির মধ্যে অমাত্যকে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন, কারণ, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অমাত্যগণের সাহায্যেই নেওয়া হয়। কৌটিল্য এই মতের বিরোধীতা করে বলেন, সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে স্বামীই প্রধান, কারণ স্বামী বা রাজা যদি দক্ষ এবং যোগ্য হন তাহলে অন্য উপাদানগুলিকেও যোগ্য করে তুলতে পারেন। তাছাড়া, অমাত্য, সৈনিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী রাজনির্দেশেই নিযুক্ত হন। রাজাই রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক এবং অন্যান্য উপাদানগুলির কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করেন। অষ্টম অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখিত 'রাজা রাজ্যমিতি প্রকৃতি সংক্ষেপ', এই বাক্যটির দ্বারা, গণপতি শাস্ত্রী এবং ইউ.এন. ঘোষালের মতে, রাজা এবং রাজ্যকে সমার্থক হিসেবেই দেখা হয়েছেক্ষ ; বলাবাহুল্য, মৌর্যযুগে রাজতন্ত্রের প্রাধান্য কৌটিল্যের তত্ত্বের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে কোন্‌টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে কৌটিল্যের মত হ'ল, আগের উপাদানটি পরের উপাদানের তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যেমন মিত্রের তুলনায় দণ্ড, দণ্ডের তুলনায় কোষ, কোষের তুলনায় দুর্গ, দুর্গের তুলনায় জনপদ, জনপদের তুলনায় অমাত্য এবং অমাত্যের তুলনায় স্বামী অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

মৌর্যপরবর্তী এবং গুপ্তযুগের রাজনৈতিক চিন্তায় উক্ত উপাদানগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মনু কৌটিল্যের মতকে গ্রহণ করেও বলেন, কোনও এক বিশেষ সময়ে কোনও কোনও উপাদান বেশীগুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মনুসংহিতার নবম অধ্যায় (২৯৫ এবং ২৯৭ শ্লোক), কামন্দকীয় নীতিসারে এবং মহাভারতের শান্তিপর্বে বিভিন্ন উপাদানগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। মনু তো দণ্ডকেই প্রকৃত রাজা বলে ব্যাখ্যা করেন। মনুভাষ্যে দেখা যায়, দণ্ডই জনগণের শাসক, রক্ষক ও ধর্মের তত্ত্বাবধায়ক। শান্তিপর্বেও বলা হয়েছে, ক্ষত্রিয়দের ক্ষমতাহীন থাকা উচিত নয়; কারণ, এতে ক্ষত্রিয় এবং প্রজা কারও সমৃদ্ধি ঘটে না (মহাভারত-শান্তিপর্ব ১৪-১৪)। রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন, শান্তিপর্বের চতুর্দশ অধ্যায়ে অন্তত ৪৮টি শ্লোক রয়েছে যেখানে দণ্ডের গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। শান্তিপর্বে পঞ্চদশ অধ্যায়ে ৩৭ থেকে ৪৫ নং শ্লোকের মূল বক্তব্য হ'ল, যদি দণ্ড কার্যকরী না হয় তাহলে রাষ্ট্রের অন্যান্য উপাদানগুলিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। শান্তিপর্বে ১২১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, প্রজাগণ প্রতিদিন দণ্ড দ্বারাই প্রতিপালিত হয়ে রাজাকে সমুন্নত করে। অতএব দণ্ডই সর্বপ্রধান। অবশ্যই এই

দণ্ডের ব্যবহার হবে ধর্মাশ্রিত ও আইনানুগ- মনুর ভাষায়, শাস্ত্রসম্মত ও মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী। পরবর্তীকালে রচিত যাজ্ঞবল্ক্য সূত্রেও দণ্ডের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রামশরণ শর্মার মতে, মৌর্যযুগের পরে সামন্ত ব্যবস্থার উদ্ভব ও প্রসারের ফলে রাজতন্ত্রের কর্তৃত্বের হ্রাস ঘটতে থাকে। এর সঙ্গে রাজাকে অন্যতম উপাদান হিসেবে না দেখে বা রাজা ও রাজ্য সমার্থক মনে করার পরিবর্তে অন্যান্য উপাদানগুলির উপর গুরুত্ব আরোপিত হতে থাকে। তাছাড়া মৌয পরবর্তীযুগে একদিকে বাইরের শত্রুর অবদমন অপরিদিকে দেশের ভিতরে বিদ্রোহ দমনের জন্য দণ্ডের উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৩৩.৪.৯ উপাদানগুলির সংকট বা ব্যাধি

রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান এবং এই উপাদানগুলির মধ্যে কোন্‌টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে আমরা কৌটিল্যের মতামত জেনেছি। এই উপাদানগুলির বিভিন্ন সমস্যা বা সংকট সম্পর্কেও কৌটিল্য 'অর্থশাস্ত্র ' গ্রন্থে অষ্টম অধিকরণে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। এই অধিকরণটির নাম হল 'ব্যাসনাধিকারিক'। যা কল্যাণের বা ভালোর পথ থেকে কোনও কিছুকে ভ্রষ্ট করে তাই হ'ল ব্যসন। অর্থাৎ স্বামী, অমাত্য, জনপদ প্রভৃতি সাতটি উপাদানের সমস্যা বা সংকট দেখা দিতে পারে এবং এর ফলে রাষ্ট্রও সংকটের মুখে পড়ে। এই সমস্যা কৌটিল্যের মতে দৈবজনিত বা মনুষ্য সৃষ্ট হতে পারে। আগুন, বন্যা, রোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতিকে কৌটিল্য দৈবজনিত সমস্যা বলেছেন। মানুষের তৈরী সমস্যাকে আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত এই দু'ভাবে তিনি ভাগ করেন। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই সংকট দেখা দেয় অমাত্য, সৈন্য, রাজকর্মচারী ইত্যাদির মাধ্যমে। বহিরাগতভাবে এই সমস্যা দেখা দেয় যখন দেশ কোনও শত্রুরাজ্য দ্বারা আক্রান্ত হয়। দেশের সম্পদ লুণ্ঠন, হত্যা, আগুন লাগানো প্রভৃতির মাধ্যমে শত্রুপক্ষ দেশের মধ্যে সংকট সৃষ্টি করে।

রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের মধ্যে কোন উপাদানটি দোষযুক্ত হলে রাষ্ট্রের পক্ষে বেশী ক্ষতি হয়---সে সম্পর্কে কৌটিল্য সমসাময়িক পণ্ডিতদের মত তুলে ধরেছেন এবং অন্যান্য মতগুলিকে বাতিল করে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। কৌটিল্যের মতে, রাষ্ট্রের উপাদানগুলির মধ্যে পরের তুলনায় আগের উপাদানটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতির দিক থেকেও পরের তুলনায় আগের উপাদানটি দোষযুক্ত হ'লে রাষ্ট্রের পক্ষে বেশী ক্ষতি হয়। ভরদ্বাজ এর মতে, দোষযুক্ত স্বামী (রাজা) এবং অমাত্য এই দু'য়ের মধ্যে দোষযুক্ত অমাত্যই বেশী বিপজ্জনক, কারণ রাজাকে মন্ত্রণা দান, মন্ত্রণার ফলাফল নির্ণয় আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা, শাস্তিদান, সেনাবাহিনী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া, রাজা ও রাজ্যের রক্ষা এসব কাজ অমাত্যরাই করে থাকেন। সুতরাং, অমাত্যের অভাবে ডানাকাটা পাখির মত রাজা অসহায় হয়ে পড়বেন। কৌটিল্য এই মতের বিরোধিতা করে বলেন অমাত্যের দোষের চেয়ে রাজার দোষই বেশী ক্ষতিকর। কারণ, রাজাই মন্ত্রী, অমাত্য, অন্যান্য গুরুত্ব কর্মচারীদের নিয়োগ ও কাজের তদারকি করে থাকেন এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতির ব্যবস্থা রাজার হাতে রয়েছে। এমনকি, অমাত্যগণ দোষী হ'লে রাজা অন্য অমাত্যকে নিয়োগ করতে পারেন। এ কারণে রাজাই হ'লেন প্রধান এবং রাজার দোষ রাষ্ট্রের পক্ষে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর।

আচার্য বিশালাক্ষ অমাত্য ও জনপদ এই দু'য়ের দোষের মধ্যে জনপদের দোষকেই বেশী ক্ষতিকর বলে

উল্লেখ করেন; কারণ কোষ দণ্ড, খনিজ ও ধাতব পদার্থসমূহ, ফসল, কারিগর প্রভৃতি জনপদ থেকেই পাওয়া যায়। কৌটিল্যের মতে, জনপদের সবরকমের কাজ ঠিকভাবে পরিচালনা, নতুন গ্রাম প্রতিষ্ঠা, রাজ্য রক্ষা ও সমৃদ্ধি ঘটানো, জরিমানা ও কর সংগ্রহের মাধ্যমে জনপদের উপকার করা--- এ সমস্ত কাজ অমাত্যগণই করে থাকেন। সেহেতু জনপদের তুলনায় অমাত্যদের দোষ দেশের পক্ষে বেশী ক্ষতিকর।

এভাবে কৌটিল্য দুর্গের তুলনায় জনপদের দোষ, কোষের তুলনায় দুর্গের দোষ, দণ্ডের তুলনায় কোষের দোষ এবং মিত্রের তুলনায় দণ্ডের দোষকে রাষ্ট্রের পক্ষে বেশী ক্ষতিকর বলে মত প্রকাশ করেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর ন্যায়তত্ত্ব আলোচনার মত কৌটিল্য সে সময়কার বিভিন্ন পণ্ডিতের বক্তব্যকে হাজির করেছেন এবং সেই সমস্ত বক্তব্যকে যুক্তির সাহায্যে বাতিল করে নিজের মত উপস্থিত করেছেন। কৌটিল্যের মতে, আগের উপাদানটি পরের উপাদানটির তুলনায় বেশী ক্ষতিকর। অবশ্য তিনি একথাও বলেন, যদি দেখা যায় একটি উপাদানের দোষের ফলে সেই দোষ অন্যান্য উপাদানগুলির ও দোষের কারণ হয় তাহলে সেই উপাদানটি বেশী ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হবে।

৩৩.৫ রাজতন্ত্র

ভারতের ইতিহাসে বৈদিক পরবর্তী যুগে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল রাজতন্ত্রের প্রসার। অর্থশাস্ত্র এ সময়েরই নির্দেশ স্বরূপ এক শাস্ত্র। স্বাভাবিকভাবেই রাজার বাছাইকরণ, রাজার গুণ, দায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি কৌটিল্যের আলোচনায় প্রধান জায়গা জুড়ে রয়েছে।

অর্থশাস্ত্রের আলোচনা থেকে মনে হয় বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রই কৌটিল্যের কাম্য শাসনব্যবস্থা। একারণে রাজ সিংহাসনে উত্তরাধিকারের বিষয়টি কৌটিল্যের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে পুত্র উপযুক্ত আত্মগুণসম্পন্ন তাকেই রাজা যুবরাজের পদে বসাবেন। কৌটিল্য রাজপুত্রদের গুণ অনুসারে বুদ্ধিমান, আহার্যবুদ্ধি ও দুর্বুদ্ধি---এই তিন ভাগে ভাগ করেন। উপযুক্ত গুরুর দ্বারা শিক্ষিত হয়ে যে পুত্র কেবলমাত্র ধর্ম ও অর্থ সম্পর্কে শিক্ষা নেয় এবং সেইরূপ আচরণও করে তাকে বুদ্ধিমানপুত্র বলা হয়। যে পুত্র ধর্ম ও অর্থ সম্পর্কে শিক্ষা নিয়ে সেইভাবে আচরণ করে না তাকে আহার্যবুদ্ধিপুত্র বলে। আর যে পুত্র দুর্বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় সেই পুত্রকে দুর্বুদ্ধিপুত্র বলা হয়। সেই দুর্বুদ্ধিপুত্র যদি বড় পুত্র এমনকি একমাত্র পুত্রও হয় তাহলেও রাজা তাকে রাজপদে বসাবেন না। যদি রাজার একাধিক পুত্র থাকে তাহলে সেই দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন পুত্রকে দেশের প্রান্তে আটক রেখে অন্য পুত্রকে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দেবেন। যদি রাজা কোনও পুত্রকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত না করে মারা যান তাহলে অমাত্যগণ রাজবংশেরই আত্মগুণসম্পন্ন রাজকুমারকে রাজপদে বসাবেন। যদি কোনও রাজপুত্র আত্মগুণ সম্পন্ন না হ'ল তাহলে রাজকন্যাকে বা রানীকে রাজপদে বসাবেন। এক্ষেত্রে কৌটিল্যের যুক্তি হল রাজপুত্র/রাজকন্যা/রানী তো ধ্বজরূপী মাত্র; অমাত্যরাই বাস্তবিক স্বামী স্থানীয়। দ্বিতীয়ত, রাজা সাধারণত আগেকার নিয়মকানুনই মেনে চলেন কিন্তু রাজবংশের বাইরে কাউকে রাজা করলে সেই নতুন রাজা প্রথা না মেনে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেন। এভাবে কৌটিল্য শুধু রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করেন নি, বংশানুক্রমিক ধারাবাহিক রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করেছেন।

৩৩.৬.১ রাজার গুণ

ষষ্ঠ অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে কৌটিল্য রাজার কয়েকটি গুণের উল্লেখ করেন। এই গুণগুলিকে আভিগামিকগুণ, প্রজাগুণ, উৎসাহগুণ, আত্মসম্পদ প্রভৃতি নামে ভাগ করা হয়েছে। আভিগামিক গুণের মধ্যে কৌটিল্য ১৬টি গুণের উল্লেখ করেন যেমন; রাজা হবেন উঁচুবংশের, সত্যবাদী, দাতা, কৃতজ্ঞ, অপরের কাছে জ্ঞানগ্রহণে আগ্রহী ইত্যাদি। রাজার ৮টি প্রজাগুণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শাস্ত্র সম্পর্কে উৎসাহ, শৌর্য্য, দৃঢ়তা, শীঘ্রতা ও সব কাজে নৈপুণ্য। উপরের গুণগুলি ছাড়াও রাজা আত্মসম্পদে বলীয়ান হবেন। এই আত্মসম্পদগুলি হ'ল বাগ্মীতা, উন্নতচিত্ত, যুদ্ধ ও সন্ধি ব্যাপারে জ্ঞানসম্পন্ন, আত্মসংযমী, বিনয়ী, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি ছয় রিপুর নিয়ন্ত্রণকারী, প্রিয়বাদী ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য, উপরের গুণগুলির উল্লেখের মাধ্যমে কৌটিল্য এক চরম আদর্শানুগ রাজার বিবরণ দিয়েছেন যা বাস্তবে আদৌ সম্ভবপর নয়। কৌটিল্যও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন এবং এ কারণে তিনি শাসকের যথাযথ শিক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রাজাকে অবশ্যই বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন, আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দন্ডনীতি সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন হ'তে হবে। উপনয়নের পর যুবরাজ উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষা নেবেন। দিনের কোন্ সময়ে কোন্ বিদ্যা যুবরাজ নেবেন সে সম্পর্কেও কৌটিল্য এক বড়রকমের তালিকা পেশ করেন; যেমন, দিনের প্রথমদিকে যুবরাজ যুদ্ধবিদ্যা শিখবেন এবং দিনের শেষ দিকে ইতিহাস শিক্ষা নেবেন। এখানে ইতিহাস বলতে কৌটিল্য পুরাণ, ইতিবৃত্ত, শাস্ত্রগ্রন্থ, ন্যায়গ্রন্থ, অর্থশাস্ত্র সব কিছুকেই বুঝিয়েছেন। কৌটিল্যের মতে, যা ভালোভাবে বোঝা যায়নি তা তিনি বারবার শুনবেন; কারণ বারবার শুনতে শুনতে প্রজ্ঞা তথা জ্ঞানের বিকাশ হয়। প্রজ্ঞা থেকে জ্ঞানের বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহ বা যোগ বাড়ে। যোগ বা আগ্রহ থেকে আত্মজ্ঞান হয়।

৩৩.৫.২ রাজার কর্তব্য

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজা রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু হ'লেও স্বৈরাচারী শাসক নন। কৌটিল্য বারবার বিভিন্ন অধ্যায়ে রাজার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন; যেমন, রাজা অভিজ্ঞ বয়স্কদের কাছ থেকে জ্ঞান নেবেন, গুপ্তপুরুষদের নিয়োগের মাধ্যমে রাজ্যের অভ্যন্তরে ও অন্যান্যদের ব্যাপারে খবরাখবর নেবেন। নিজে ভালো হয়ে প্রজাদেরও ভালো হ'তে বলবেন। প্রজাদের কাছে প্রিয় হবেন এবং প্রজাদের ভালো করার মাধ্যমে নিজের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করবেন। রাজা যদি নিজের কাজে উদ্যোগী হন তাহলে অমাত্য ও অন্যান্য কর্মচারীরাও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবেন। রাজার একদিনের তথা ২৪ ঘন্টার যে কাজের তালিকা কৌটিল্য দেখিয়েছেন তা একদিকে যেমন বিস্ময়কর অন্যদিকে বিষয়বৈচিত্রে পূর্ণ; যেমন, রাজা দিনের আটভাগের প্রথমভাগে গতদিনের আয়ব্যয়ের হিসেব ও গতরাত্রের প্রহরার কাজ দেখবেন; দ্বিতীয়ভাগে পুরবাসী ও জনপদবাসীদের কাজ দেখবেন; তৃতীয়ভাগে স্নান, ভোজন ও বেদাধ্যয়ন করবেন; চতুর্থভাগে নগদ টাকার হিসেব নিকেশ করবেন ও অধ্যক্ষদের কাজে নিযুক্ত করবেন; পঞ্চমভাগে মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে মন্ত্রণা করবেন এবং অমাত্য ও গুপ্তচরদের উপর নজর রাখবেন; ষষ্ঠভাগে স্বচ্ছন্দ-বিহার বা মন্ত্রণা করবেন; সপ্তমভাগে হাতি, ঘোড়া, রথ ও অস্ত্র সকল দেখবেন; অষ্টম ভাগে সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়ে আলোচনা করবেন; দিনের শেষে তিনি সন্ধ্যাকালীন উপাসনা করবেন। ঠিক একইভাবে রাত্রের অষ্টমভাগের বিষয়েও কৌটিল্য

এক বিস্তারিত বিবরণ দেন।

রাজকার্য পরিচালনার ব্যাপারে ও কৌটিল্য প্রজাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগর কথা বলেন। সভায় যাতে প্রজারা সহজে রাজার কাছে উপস্থিত হ'তে পারে এবং অভিযোগ জানাতে পারে সে ব্যাপারে রাজাকে ব্যবস্থা করতে হবে। কৌটিল্য বারবার মনে করিয়ে দিতে চান রাজার পক্ষে উদ্যোগ বা সবসময় কাজে ব্যস্ত থাকা ব্রত স্বরূপ; কাজ রাজার কাছে যজ্ঞস্বরূপ; সমান ব্যবহার রাজার পক্ষে দক্ষিণাস্বরূপ; প্রজার মঙ্গলই রাজার মঙ্গল। এ ব্যাপারে কৌটিল্য ধর্মের দোহাইও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রজারক্ষক রাজার স্বধর্ম পালন রাজাকে স্বর্গপ্রাপ্তির অধিকারী করে এবং প্রজাগণের মিথ্যাদণ্ডের প্রণয়নকারী রাজা নরক প্রাপ্তির অধিকারী হন। (অর্থশাস্ত্র ৩.১.৪১)।

৩৩.৬ প্রজা বিদ্রোহ

রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি কৌটিল্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা বা দণ্ডের প্রয়োগ সম্পর্কে রাজাকে যথেষ্ট সতর্ক হ'তে বলেন; কারণ, অন্যায়ভাবে দণ্ডের প্রয়োগ হ'লে প্রজারা অসন্তুষ্ট হতে পারে, বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে; এমনকি অন্য রাজার সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। এ কারণে প্রজাবিদ্রোহের বিষয়টি কৌটিল্যের আলোচনায় যথেষ্ট গুরুত্বসহকারেই আলোচিত হয়েছে।

৩৩.৬.১ প্রজা বিদ্রোহের কারণ

প্রকৃতি অনুসারে প্রজাদের কৌটিল্য তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেন; যথা ক্ষীণ, লোভী ও বিক্ষুব্ধ প্রজা। এদের মধ্যে ক্ষীণের তুলনায় লোভী এবং লোভীর তুলনায় বিক্ষুব্ধ প্রজাই রাষ্ট্রের পক্ষে অধিকতর বিপদজনক। কারণ, ক্ষীণপ্রজা শাস্তি ও উচ্ছেদের ভয়ে অনুগত থাকতে বা পলায়নে পছন্দ করে। লোভীপ্রজা লোভের জন্য অসন্তুষ্ট হয়ে শত্রু দ্বারা বশীভূত হ'তে পারে কিন্তু বিক্ষুব্ধ প্রজারা শত্রুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নিজ রাজার প্রতি আক্রমণেরও আয়োজন করে। সপ্তম অধিকরণের পঞ্চম অধ্যায়ে রাজার সেই সমস্ত কাজগুলির উল্লেখ করা হয়েছে যার ফলে প্রজাগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। এই কাজগুলি হ'ল যথাক্রমে (১) বিদ্যাদি সম্পন্ন সৎ মানুষের প্রতি অবজ্ঞা ও অসৎ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ দেখানো; (২) অনুচিত ও অধর্মযুক্ত হিংসাত্মক কাজের প্রচলন; (৩) অধর্মযুক্ত, অর্থাৎ অন্যায় কাজের প্রতি আসক্তি ও ন্যায় কাজের প্রত্যাখ্যান (৪) অনর্থযুক্ত কাজ করা ও করণীয় কাজ থেকে বিরত থাকা, (৫) ভৃত্যদের বেতন ও অন্যান্য দেয় বস্তুগুলি না দেওয়া ও অন্যের কাছ থেকে বলপূর্বক সম্পদ বা ঘুষ নেওয়া, (৬) শাস্তিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তিমকুব বা হ্রাস এবং শাস্তির বর্হিভূত ব্যক্তিকে শাস্তিদান, (৭) চোর ইত্যাদি দুষ্ট ব্যক্তিদের নিজের পাশে রাখা এবং গুণী ও যোগ্যব্যক্তিদের দূরে রাখা; (৮) অনর্থকারী কাজের সম্পাদন এবং অর্থযুক্ত কাজে অনীহা; (৯) চুরি থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়া বা নিজে অপহরণকারী হওয়া; (১০) পুরুষকারের ও কাজের সম্যক অনুষ্ঠানজনিত গুণের নিন্দা; (১১) যোগ্য কর্মাধ্যক্ষগণের উপর দোষারোপ এবং পুরোহিতাদি মান্য ব্যক্তিদের অবমাননা; (১২) বিদ্যা দ্বারা বৃদ্ধগণের মধ্যে সংশয়বৃদ্ধি ও অসত্যকথা দ্বারা বিরোধ ঘটানো; (১৩) উপকারের বিনিময়ে অপকার করা ও নিত্যকরণীয় কাজ থেকে বিরত থাকা; (১৪) রাজার আলস্য বা ভুল বশত যোগ (অলব্ধের লাভ) এবং ক্ষেম (লব্ধের প্রতিপালন) এর নাশ। রাজার এ ধরণের কাজগুলি প্রজাদের

মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি করে ও প্রজাদের বিদ্রোহী করে তোলে। এব্যাপারে কৌটিল্যের পরামর্শ হ'ল রাজা কখনই প্রজাদের অসন্তোষের কারণগুলি উৎপাদন করবেন না---সেগুলি উৎপাদিত হ'লেও তৎক্ষণাৎ তিনি তার প্রতিকার করবেন।

বিদ্রোহের বিভিন্ন কারণ ও ধরন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনার লক্ষ্য হ'ল রাজাকে সতর্ক করে দেওয়া যাতে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব না হয় বা হ'লেও কীভাবে রাজা তার মোকাবিলা করবেন। কৌটিল্য বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি---বিদ্রোহকে এক অবাঞ্ছিত পথ বলেই মনে করেছেন। কৌটিল্যের মতে, যে কোনও রাজা, এমনকি দোষযুক্ত হ'লেও, রাজ্যপরিচালনার আগেকার নিয়মকানুনই মেনে চলেন। কিন্তু নতুন রাজা কোনরকম প্রথা না মেনে সেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেন। তাছাড়া, রাজা দোষযুক্ত বা দুর্বল হ'লেও আভিজাত্যের কারণে অন্যান্য রাজকর্মচারীগণ, অমাত্যগণ, সেনাগণ রাজাকে মেনে চলে। এখানে কৌটিল্যের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐশ্বর্যের স্বভাবই হ'ল আভিজাত্যের অনুবর্তন করা। ঐশ্বর্য্যশালী ও অভিজাত বংশে জন্মজ রাজাকে প্রজারা মেনে চলবে কিন্তু রাজা নীচকুলজাত হ'লে অন্যান্যরা সুযোগ পেলেই অসহযোগী হয়ে ওঠে। এভাবে কৌটিল্য আভিজাত্যপূর্ণ রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করে গেছেন।

৩৩.৬.২ প্রজাবিদ্রোহের ধরন

কৌটিল্য রাজার বিরুদ্ধে দু'ধরনের বিদ্রোহের সম্ভাবনার কথা বলেন। (এক) মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি ও যুবরাজ---এই চারজনের বা চারজনের সঙ্গে যে কোনও এক বা একাধিক জনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ যাকে কৌটিল্য অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বলেছেন। মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি ও যুবরাজ ছাড়া অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে তা অন্তরামাত্যজনিত বিদ্রোহ বলে। এই দু'ধরনের বিদ্রোহই অভ্যন্তর বিদ্রোহ যা দেশের ভিতর থেকেই সৃষ্ট হয়। এই দু'ধরনের বিদ্রোহের মধ্যে প্রথম ধরনের বিদ্রোহ রাজার নিজের দোষে বা অপরের ক্ষমতালোভে হ'তে পারে। যদি রাজার নিজের দোষে এ বিদ্রোহ ঘটে তাহলে রাজা সেই দোষ কাটিয়ে উঠে বিদ্রোহের মোকাবিলা করবেন। অপরদিকে, মন্ত্রী পুরোহিত, সেনাপতি বা যুবরাজ এর ক্ষমতার লোভে যদি এ বিদ্রোহ হয় তাহলে রাজা এই বিদ্রোহ দমনে তাদের ক্ষমতা ও অপরাধ অনুসারে দণ্ডদানের ব্যবস্থা করবেন। যেমন, পুরোহিত যদি অপরাধী হন তাহলে মৃত্যুর পরিবর্তে তার দণ্ড হবে হয় বন্দী করা বা দেশ থেকে বিতাড়িত করা। যুবরাজ যদি অপরাধী হয় এবং যদি রাজার অন্য কোনও গুণবান পুত্র থাকে তাহলে সেই যুবরাজের শাস্তি হবে বন্দী করা অথবা হত্যা করা। এর আগে অবশ্য রাজা বিভিন্ন ধরনের সুযোগ দিয়ে বশে আনার চেষ্টা করবেন। নতুবা সেই বিদ্রোহীকে সৈন্যের অধিনায়ক করে যুদ্ধে পাঠাবেন এবং যুদ্ধে পাওয়া জিনিষপত্র তার অধিকারভুক্ত করার অনুমতি দেবেন। অন্যান্য রাজকর্মচারীরা যে বিদ্রোহের সামিল হয় তা দমনের জন্য রাজা সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড এই চার ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করবেন।

অন্য রাষ্ট্রের প্রধান সীমান্তবর্তী এলাকার প্রধান, বনাঞ্চল প্রধান প্রমুখ ব্যক্তিদের সৃষ্ট বিদ্রোহকে বাহ্য বা বহিরাগত বিদ্রোহ বলে। এ ধরনের বিদ্রোহ দেখা দিলে রাজা এই বিদ্রোহ দমনে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবেন। অথবা নিজ মিত্রদ্বারা তাকে মিত্রতাজালে বদ্ধ করবেন।

কৌটিল্যের মতে, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এই দু'ধরনের বিদ্রোহের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহই বেশী

ভয়াবহ এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের মধ্যে একেবারে নিকটজনের কাছ থেকে বিদ্রোহ আরো বেশী ভয়াবহ। যে কোনও ধরনের বিদ্রোহের মোকাবিলাতে রাজা সাম, দান (অর্থদান, করমুক্তি বা বিশেষ পদ দানও বোঝায়) ভেদ (বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্রোহীকে দুর্বল করা) এবং দণ্ড (প্রয়োজনে হত্যা)---এই চার ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে যেটি উপযুক্ত মনে করবেন তার প্রয়োগ করবেন।

প্রকৃতি অনুসারে বিদ্রোহকে কৌটিল্য আবার দু'ভাগে ভাগ করেন---শুদ্ধ ও মিশ্র বিদ্রোহ। বিদ্রোহ শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তর বা বাহ্যিক হ'লে তা শুদ্ধ বিদ্রোহ; যে ক্ষেত্রে বিদ্রোহ দেশদ্রোহী ও বহি:শত্রুর মধ্যে মিলিত প্রচেষ্টার হয় তাকে মিশ্র বিদ্রোহ বলে। যে কোনও বিদ্রোহেই অবশ্য রাজা জনগণের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের পরিবর্তে অন্যান্য উপায়সমূহ, যথা সাম, দান ও ভেদ প্রয়োগ করবেন; কারণ, অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগে প্রজাগণ আরো বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে।

৩৩.৭ বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা

প্রাচীন ভারতে বৈদিকযুগের শেষের দিকে নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমানা নিয়ে রাষ্ট্রের অবস্থা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টিও গুরুত্ব পেতে থাকে। কোনও রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, রাষ্ট্রের সীমানার প্রসার ঘটানো প্রভৃতি বিষয়গুলি যে অন্য রাষ্ট্রের অবস্থান, গতি-প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সে সম্পর্কে সে সময়ের রাজা এবং পণ্ডিতগণ ক্রমশ সচেতন হ'তে থাকেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও মহাভারতের শান্তিপর্বে আমরা এই চিন্তা চেতনারই প্রকাশ লক্ষ করি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, বিশেষ করে অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায় এবং সপ্তম অধিকরণ জুড়ে, অন্যরাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনার বিষযটি আলোচিত হয়েছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অন্যরাজের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে বিজিগীষু (যিনি সাম, দান, কোষ ও দণ্ড প্রয়োগের মাধ্যমে শত্রুকে জয় করতে ইচ্ছুক) রাজাকে কেন্দ্র করে। নিজের ক্ষমতা ও রাজ্যের এলাকা বাড়াতে ইচ্ছুক রাজা কীভাবে অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনা করবেন সেই বিষয়টি কৌটিল্য আলোচনা করেছেন 'রাজমণ্ডল' তত্ত্বের মাধ্যমে---যেখানে রাজা চারপাশেই শত্রু ও মিত্র দিয়ে ঘেরা। এই রাজমণ্ডলে বা বৃত্তে মোট রাষ্ট্রের সংখ্যা কত সে সম্পর্কে অর্থশাস্ত্র গ্রন্থেই দু'টি ধারণা রয়েছে। একটা ধারণা অনুসারে দশটি রাষ্ট্র নিয়ে গড়ে ওঠা দশ রাজমণ্ডল এবং মধ্যম ও উদাসীন এই দু'টি নিয়ে অর্থাৎ মোট ১২টি রাষ্ট্র নিয়ে গড়ে ওঠে দ্বাদশ রাজমণ্ডল। এই ১২টি রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

(১) বিজিগীষু রাজা, অর্থাৎ যিনি নিজের ক্ষমতা বাড়াতে ইচ্ছুক;

(২) অরি, অর্থাৎ বিজিগীষু রাজার বন্ধু যার রাজ্যের সীমানা বিজিগীষু রাজার বন্ধুর সীমানার পর;

(৩) মিত্র, অর্থাৎ বিজিগীষু রাজার বন্ধু যার রাজ্যের সীমানা শত্রু রাজ্য সীমানার পরে;

(৪) অরি মিত্র বা শত্রু বন্ধু --- শত্রুর বন্ধু যার রাজ্য সীমানা বিজিগীষু রাজার বন্ধুর সীমানার পর;

(৫) মিত্রমিত্র---বিজিগীষু রাজার মিত্রের মিত্র যার অবস্থান শত্রুর মিত্রের রাজ্যের সীমানার পরে;

(৬) অরি মিত্র মিত্র---শত্রুর মিত্রের মিত্র যার রাজ্য সীমানা বিজিগীষু রাজার মিত্র মিত্রের রাজ্য সীমানার পরেই;

বিজিগীষু রাজার পিছনে থাকেন

(১) পার্ষ্ণিগ্রাহ যিনি শত্রুর মঙ্গলের জন্য বিজিগীষু রাজার পার্ষ্ণি অর্থাৎ পিছনে থাকেন এবং সে কারণে বিজিগীষু রাজার শত্রু।

(২) আক্রন্দ যিনি বিজিগীষু রাজার মঙ্গলের জন্য পার্ষ্ণিগ্রাহকে বাধা দিতে পারেন। সুতরাং তিনি বিজিগীষু রাজার বন্ধু;

(৩) পার্ষ্ণিগ্রাহসার যিনি পার্ষ্ণিগ্রাহকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন, একারণে তিনি বিজিগীষু রাজার শত্রু;

আক্রন্দাসার, যিনি আক্রন্দের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ইনি বিজিগীষু রাজার ও বন্ধু।

এই দশজন ছাড়াও আরো দু'জন রাজা রয়েছেন যাদের কৌটিল্য মধ্যম এবং উদাসীন রাজা বলে উল্লেখ করেন। মধ্যম রাজা হ'লেন সেই ধরনের রাজা যিনি বিজিগীষু এবং তাঁর শত্রুরাজা উভয়ে তুলনায় বেশী ক্ষমতাশালী এবং উভয়কেই সাহায্য করতে পারেন। আর যে রাজা বিজিগীষু, শত্রুরাজা এবং মধ্যম রাজা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করেন, বেশী ক্ষমতাশালী এবং যিনি উপরোক্ত সব রাজাকেই সাহায্য করতে বা দমন করতে পারেন তিনি হলেন উদাসীন রাজা।

এই দ্বাদশ রাজার আবার প্রত্যেকেরই অমাত্য, জনপদ, দূর্গ, কোষ এবং দণ্ড প্রভৃতি পাঁচটি উপাদান বা প্রকৃতি রয়েছে। সুতরাং, ১২ জন রাজা এবং প্রত্যেক রাজার পাঁচটি করে উপাদান বা প্রকৃতি মোট ৭২টি (১২ + ৫ X ১২) উপাদান নিয়ে কৌটিল্যের আন্তঃরাজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সুতরাং, বিজিগীষু রাজা বিদেশ সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ৭২টি উপাদান ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সচেতন থাকবেন।

কৌটিল্যের মতে, বিজিগীষু রাজার শত্রু বা মিত্রের প্রকৃতি বা স্বভাবও একই রকমের নয়। বিজিগীষু রাজার রাজ্য সীমানার কাছাকাছি যে শত্রুরাজা তিনি বিজিগীষু রাজার সহজ বা স্বাভাবিক শত্রু। আবার, রাজার সমান বংশে জাত যে শত্রু সেই রাজাও বিজিগীষু রাজার সহজ বা স্বাভাবিক শত্রু। অপরদিকে যে শত্রু নিজেই বিরোধীতায় এগিয়ে আসে বা অন্য রাজার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিরোধী হয়ে ওঠে সেই রাজা বিজিগীষু রাজার কৃত্রিম বা সাময়িক শত্রু।

একইভাবে, বিজিগীষু রাজার রাজ্য সীমানার এক রাজ্যের ব্যবধানে (শত্রু রাজ্যের পরেই যার অবস্থান) তিনি সহজ বা স্বাভাবিক মিত্র। মা বা বাবার বংশের সম্পর্কের মিত্র ও স্বাভাবিক বা সহজ মিত্র। অপরদিকে, যে মিত্র নিজের ধর্ম ও জীবনের জন্য বিজিগীষু রাজার আশ্রয় নেয় সেই মিত্র হ'ল বিজিগীষু রাজার কৃত্রিম বা সাময়িক মিত্র। এই মিত্রের প্রকৃতি অনুসারে বিজিগীষু রাজা তাঁর বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা

করবেন এবং দেশীয় রাজনীতিতে সিদ্ধান্ত নেবেন।

৩৩.৭.১ মূলনীতিসমূহ

বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার ব্যাপারে কৌটিল্য ছয়টি নীতির (ষাড়গুণ্য) কথা বলেন। এগুলি হ'ল ঃ সন্ধি, বিগ্রহ, আসন, যান, সংশ্রয় এবং দ্বৈধীভাব। দু'দেশের রাজার মধ্যে কতকগুলো শর্ত মেনে যদি চুক্তি হয় তার নাম সন্ধি বা শান্তির নীতি। শত্রুর সঙ্গে বিরোধের নাম বিগ্রহ; অন্য রাজার প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থানের নাম আসন; অন্যরাজ্যের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠানো বা আক্রমনের নাম যান; অন্যরাজার কাছে আশ্রয় নেওয়ার নাম সংশয় এবং একই সময়ে এক রাজার প্রতি যুদ্ধ অন্যরাজার সঙ্গে সন্ধি---এই দুই নীতি গ্রহণের নাম দ্বৈধীভাব।

বাতব্যাধির মতে বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার মাত্র দু'টি নীতিই রয়েছে — হয় সন্ধি নয়তো যুদ্ধ। এই মত বাতিল করে কৌটিল্য বলেন, বৈদেশিক সম্পর্কের বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলায় ছ'টি নীতিই গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজা কোন নীতি অনুসারে কাজ করবেন তা নির্ভর করবে সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর। যেমন, নিজেকে শত্রুর চেয়ে দুর্বল মনে করলে বিজিগীষু রাজা শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করবেন আর নিজেকে তুলনায় শক্তিশালী বলে মনে করলে যুদ্ধই হবে রাজার উপযুক্ত নীতি। সমান ক্ষমতা সম্পন্ন দুই রাজার মধ্যে আসন বা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই কাম্য। অপরদিকে, নিজেকে খুবই দুর্বল মনে করলে সংশ্রয় বা অন্য রাজার কাছে আশ্রয় সম্ভাবনা থাকে এবং সেই সাহায্য পাওয়ার পর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা যেতে পারে এরকম মনে করলে রাজা দ্বৈধীভাব অনুসরণ করবেন। এই ছয়নীতির মধ্যে যে নীতি অনুসরণ করলে নিজের দুর্গ সীমানা, বাণিজ্যপথ, খনি, বন প্রভৃতি রক্ষা এবং শত্রুপক্ষের উপরোক্ত বিষয়গুলি ধ্বংস করতে পারবেন সেই নীতিই বিজিগীষু রাজা অনুসরণ করবেন।

৩৩.৭.২ সন্ধি

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনায় কৌটিল্য সন্ধির উপর বেশ জোর দিয়েছেন। কৌটিল্যের মতে কোনও রাজা তখনই সন্ধি করবেন যখন তিনি নিজেকে অন্য পক্ষের তুলনায় কম শক্তিশালী বলে মনে করবেন। সন্ধির শর্তের ধ্বরন অনুযায়ী সন্ধিকে দণ্ডোপনত সন্ধি, কোষোপনত সন্ধি এবং দেশোপনত সন্ধি---এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। যদি সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সৈন্য সমর্পন করতে হয় তাহলে সেই সন্ধিকে দণ্ডোপনত সন্ধি বলে। যদি সন্ধির শর্ত অনুযায়ী অর্থ সম্পদ হস্তান্তর করতে হয় তাহলে সেই সন্ধি হল কোষাপনত সন্ধি। আর যদি সন্ধির শর্ত অনুযায়ী কোনও এলাকা দিতে হয় তাহলে সেই সন্ধিকে দেশোপনত সন্ধি বলে। সন্ধি কিভাবে করা হচ্ছে সেই অনুযায়ী সন্ধিকে আবার পরিপনিত সন্ধি এবং অপরিপনিত সন্ধি— এই দুভাবে ভাগ করা হয়। যদি সন্ধির শর্তের মধ্যে কোনও কাজের ব্যাপারে নির্দেশ থাকে তাহলে সেই সন্ধি হয় পরিপনিত সন্ধি। যদি সন্ধির মধ্যে দেশ কাল বা কাজের কোনও শর্ত না থাকে এবং শুধুমাত্র কথাবার্তার বিশ্বাস এর উপর সন্ধি হয় তাহলে সে সন্ধিকে অপরিপনিত সন্ধি বলে।

দণ্ডোপনত সন্ধি আবার তিন ধরনের হ'তে পারে। যথা আত্মামিষ সন্ধি, পুরুষান্তর সন্ধি এবং অদৃষ্ট পুরুষ সন্ধি। নির্দিষ্ট সংখ্যার সৈন্য ও অর্থ নিয়ে দুর্বল রাজা যখন শক্তিশালী শত্রু রাজার কাছে হাজির হয়

এবং তার সেবা করে তখন সেই সন্ধিকে আত্মামিষ (আত্ম + আমিষ অর্থাৎ নিজেই ভোজ্য) সন্ধি বলে। সেনাপতি ও রাজপুত্রকে শক্তিশালী শত্রুরাজার কাছে পাঠিয়ে যে সন্ধি হয় সেই সন্ধিকে পুরাষান্তর সন্ধি বলে। শত্রুরাজার কাজের জন্য দুর্বল রাজা যখন একাকী কোনও স্থানে যেতে বাধ্য হয় তখন সেই চুক্তিকে অদৃষ্টপূর্ব সন্ধি বলে।

কোষোপনত সন্ধি চার রকমের হ'তে পারে। যে সন্ধিতে অমাত্যদের শক্তিশালী শত্রুর হাত থেকে অর্থ দিয়ে মুক্ত করা হয় তখন সেই সন্ধিকে পরিচয় সন্ধি বলে। এই সন্ধিতে যদি অর্থ শোধকরার ব্যাপারটি কিস্তিতে কিস্তিতে দেবার ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেই সন্ধি হয় উপগ্রহ সন্ধি। আবার, যদি দেয় অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে দেবার ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেই সন্ধিকে বলে অত্যয় সন্ধি। যদি সুবিধামত সময়ে অর্থ দেবার সুযোগ থাকে তাহলে সেই চুক্তিকে সুবর্ণসন্ধি বলে। এর বিপরীত, অর্থাৎ যখন সমস্ত অর্থ সেই মুহূর্তেই দিতে হবে বলে চুক্তি হয় তখন সেই সন্ধিকে কপাল সন্ধি বলে।

দেশোপনত সন্ধিও চার রকমের হয়। যথা আদিষ্ট সন্ধি, উচ্ছিন্ন সন্ধি, আক্রয় সন্ধি ও পরদূষণ সন্ধি। দেশ ও অমাত্যদের রক্ষার জন্য যে সন্ধিতে ভূমির একাংশ হস্তান্তর করা হয় সেই সন্ধিকে আদিষ্ট সন্ধি বলে। যে সমস্ত ভূমি থেকে আগেই ফসল তুলে নেওয়া হয়েছে সেই সব ভূমি শত্রুকে দিয়ে সন্ধি করলে তাকে উচ্ছিন্ন সন্ধি বলে। কোন ভূমির উৎপন্ন ফসল দিয়ে পরে সেই জমি ছাড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা যদি চুক্তিতে থাকে তাহলে সেই সন্ধির নাম অবক্রয় সন্ধি। কিন্তু যে সন্ধিতে ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসল দিয়েও তার সঙ্গে আরো কিছু দেবার শর্ত থাকে তাহলে সেই সন্ধিকে পরদূষণ সন্ধি বলে।

উপরোক্ত সমস্ত সন্ধিগুলি দুর্বল রাজা সময় ও স্থান বিবেচনা করে করবেন। কৌটিল্যের মতে, যদিও বলা হয় সন্ধি দুর্বল রাজার পক্ষে কাম্য তা সত্ত্বেও শক্তিশালী রাজাও কয়েকটি বিশেষ দিক বিবেচনা করে সন্ধি করতে পারেন। কৌটিল্য এরকম ১৪টি বিশেষ দিকের উল্লেখ করেছেন; যেমন, সন্ধির মাধ্যমে নিজ দূর্গের রক্ষা ও শত্রু দূর্গের ধ্বংস করা, শত্রুরাজের মধ্যে বিভেদ তৈরী করা ইত্যাদি।

সন্ধির ব্যাপারে আরেকটি বিষয়ও জানা প্রয়োজন। প্রতিটি সন্ধিই এক সাময়িক ব্যবস্থা এবং তা সাধারণত দুর্বল রাজার জন্যই। রাজার ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধির শর্ত মানার ব্যাপারেও অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। কৌটিল্যের আগেকার পণ্ডিতদের মতে, কথা বা শপথ দিয়ে যে সন্ধি হয় সেই সন্ধির কোনও নিশ্চয়তা নেই। একমাত্র যে সন্ধিতে কোনও জামিন রাখা হয় সেই সন্ধিরই নিশ্চয়তা থাকে। কৌটিল্য এই মতের বিরোধীতা করে বলেন, সত্য কথা ও শপথ দিয়ে যে সন্ধি হয় সেই সন্ধির স্থায়িত্ব বেশী কারণ এক্ষেত্রে সন্ধি ভঙ্গকারীর ইহলোকে (সত্য ভঙ্গ জনিত অপবাদ) এবং পরলোকে (নরকপাতের) ভয় থাকে। মানুষের মনে বিশ্বাস ও সংস্কার যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সে ব্যাপারে বাস্তববাদী তাত্ত্বিক কৌটিল্য যথেষ্ট সজাগ।

৩৩.৭.৩ যুদ্ধ

নিজেকে শত্রুর তুলনায় দুর্বল মনে করলে বিজিগীষু রাজা যেমন সন্ধি করবেন অপরদিকে নিজেকে বেশী শক্তিশালী মনে করলে বিজিগীষু রাজার পক্ষে বিগ্রহ করাই উপযুক্ত। বিগ্রহ বলতে বোঝায় সংঘাত বা সংকট যা আত্মরক্ষায় বা অন্য রাজ্য গ্রাস করতে ব্যবহার করা হয়। বিজিগীষু রাজা নিম্নোক্ত কারণে বিগ্রহ

করতে পারেন—(১) নিজ জনপদে অনেক যোদ্ধা আছে বা অন্যান্য শ্রেণী আছে (২) রাজার সৈন্যদুর্গ, বনদুর্গ ও নদীদুর্গ রয়েছে এবং একটি মাত্র দ্বার দিয়ে সুরক্ষিত হওয়ায় জনপদ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ (৩) রাজা নিজের দুর্ভেদ্য সীমান্ত দুর্গ থেকে শত্রুর দুর্গ ধ্বংস করতে সক্ষম (৪) শত্রু যখন নানা প্রকার অসুবিধায় সম্মুখীন ও হতাশ (৫) শত্রু অন্য জায়গায় যুদ্ধে ব্যস্ত। মোট কথা, বিজিগীষু রাজা সব সময় লক্ষ রাখবেন যাতে বিগ্রহের মাধ্যমে তার রাজ্যের বৃদ্ধি ও উন্নতি হতে পারে।

৩৩.৭.৪ দূতের কাজ

অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ বজায় রাখার কাজটি সম্পাদিত হবে দূতের মাধ্যমে । কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দূতের বিষয়টি এতই গুরুত্বসহকারে আলোকিত হয়েছে যে, কৌটিল্য দূতকে চণ্ডাল হ'লেও অবধ্য বলে উল্লেখ করেন। কাজের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী দূত দু'রকমের হয়--- (১) ভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনায় নিযুক্ত দূত; (২) ভিন্নরাজ্যের দূতের কাজ লক্ষ্য করার জন্য নিযুক্ত প্রতিদূত। দূতের ক্ষমতার প্রকৃতি অনুসারে আবার দূতকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। (১) নিসৃষ্টার্থ দূত যিনি সব রকমের অমাত্যগুণসম্পন্ন এবং প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী; (২) পরিমিতার্থ দূত যার নিসৃষ্টার্থ দূতের গুণের চার ভাগের এক ভাগ কম থাকে এবং তুলনামূলকভাবে কম ক্ষমতাসম্পন্ন (৩) শাসনহর দূত---যে সব দূতের নিসৃষ্টার্থ দূতের গুণের অর্ধেক কম থাকে। এধরনের দূত নিছক খবরাখবর পৌঁছে দেবার কাজ করে।

কৌটিল্যের মতে, মন্ত্রণার বিষয়টি ঠিক হওয়ার পরেই দূত পাঠানোর বিষয়টি স্থির হওয়া দরকার। শত্রুরাজাকে কী বলতে হবে শত্রু রাজার উত্তরে তিনি কী বলবেন, কিভাবে শত্রু রাজাকে নিজের বশে নিয়ে আসবেন—এসব সম্পর্কে দূতের ভালো জ্ঞান থাকা দরকার। কৌটিল্য দূতের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বেরও উল্লেখ করেন---(১) নিজ রাজার খবর শত্রুবাজার কাছে জানানো (২) আগে যে সমস্ত চুক্তি বা সন্ধি হয়েছে সেগুলি রক্ষা করা (৩) নিজ রাজার প্রতাপ দেখানো (৪) শত্রুরাজ্যের মধ্যে মিত্র সংগ্রহ (৫) শত্রুর কর্মচারীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা (৬) শত্রুর মিত্রদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা (৭) শত্রু এলাকার গুপ্তচর পাঠানো (৮) শত্রুর বন্ধু ও সম্পদ অপহরণ (৯) গোপনে সংবাদ সংগ্রহ (১০) জামিন ব্যক্তিদের মুক্তিতে সাহায্য করা (১১) গোপন কাজকর্ম পরিচালনা করা। (১২) শত্রুর শাসক, সীমানা রক্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারীর সঙ্গে যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলা (১৩) শত্রুপক্ষের সৈন্য, দুর্গ, জনপদ, কোষ ইত্যাদির পরিমাণ, অবস্থান, জনগণের জীবিকার ধরন, শাসনকাজের ধরন, রাজার স্বভাব ও দোষ প্রভৃতি বিষয়েও দূত খবর নেবেন। প্রয়োজন হ'লে ছদ্মবেশ ধারণ করেও তিনি খবর সংগ্রহ করবেন। চিকিৎসকের বেশে, সাধারণ বেশে এবং দরকার হ'লে ভিক্ষুক, মাতাল, পাগল, ঘুমন্ত ব্যক্তির ভান করে ও শত্রুর সব তথ্য সংগ্রহ করবেন। এ ব্যাপারে দূত অবশ্যই গোপনীয়তা বজায় রাখবেন। এ কারণে তিনি মদ্য, কাম ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবেন। এমনকি তিনি একাকী নিদ্রা যাবেন, কেননা অনেক সময় ঘুমন্ত অবস্থায় প্রলাপ এর মাধ্যমে মন্ত্রণা প্রকাশ পেতে পারে।

যদি কোনও কারণে শত্রু রাজা দূতকে আটক করে, অথাৎ নিজের দেশে ফিরে যেতে না দেয় তাহলে দূত এর কারণ সম্পর্কে চিন্তা করবেন এবং এক্ষেত্রে কী করা উচিত সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন। যে সমস্ত কারণগুলি সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করবেন তা হ'ল ঃ—(১) দূতের নিজ রাজার কোনও বিপদ

ঘটানোর জন্য (২) শত্রুরাজা দূতকে আটকে নিজের কোনও বিপদের প্রতিকার করার জন্য। (৩) দূতের রাজ্যে অমাত্যদি গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারীদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটানোর জন্য (৪) শত্রুরাজা নিজের রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করার জন্য (৫) দূতের প্রভু রাজার কোনও পরিকল্পিত আক্রমণ রদ করার জন্য। এ সমস্ত কারণের মধ্যে কোন্ কারণে দূতকে আটক করা হয়েছে সে সম্পর্কে দূত নিজেই বিবেচনা করে ঠিক করবেন তিনি আটক অবস্থাতে কাটাবেন নাকি আটক অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে তৎপর হবেন। মোট কথা নিজ প্রভুর অভিষ্ট সাধনই দূতের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

৩৩.৮ সারাংশ

এই এককটিতে অর্থশাস্ত্রের যে আলোচনাটি করা হ'ল, তা থেকে প্রাচীন ভারতের রাজনীতিচর্চার ক্ষেত্রে এই মহাগ্রন্থের তাত্ত্বিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যটি বোঝা গেল। রাষ্ট্রের উদ্ভব, প্রকৃতি, প্রকারভেদ, উপাদান, উপাদানগুলির পারস্পারিক সম্পর্ক, রাজতন্ত্রের স্বরূপ, রাজার কর্তব্য, প্রজাবিদ্রোহের কারণ ও ধরন, বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতিসমূহ, সন্ধি ও যুদ্ধের স্বরূপ, দূতের ভূমিকা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই আলোচনার অন্তর্গত। সর্বোপরি, আলোচিত হ'ল বর্তমানকালেও এই গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি।

৩৩.৯ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

(১) কৌটিল্য বিদ্যাসমূহের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তার উল্লেখ করুন।

(২) রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে কৌটিল্যের বক্তব্য ব্যাখ্যা করুন।

(৩) কৌটিল্য যে সপ্তাঙ্গতত্ত্বের কথা বলেছেন তা অত্যন্ত সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

(৪) বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার মূলনীতিগুলি কী কী?

(৫) কৌটিল্যের মতে সন্ধি কয় প্রকার?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

(১) কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র বলতে কী বুঝিয়েছেন?

(২) কৌটিল্যের মতে প্রজাবিদ্রোহের কারণগুলি কী কী?

(৩) কৌটিল্য দণ্ডনীতি বলতে কী বুঝিয়েছেন?

(৪) কৌটিল্যের মতে দূতের কাজগুলি কী কী?

(৫) কৌটিল্য কীভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করেছেন?

৩৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী ঃ (১৯৯৮) দণ্ডনীতি, কলিকাতা, সাহিত্যসংসদ,

২। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক ঃ (১৯৬৭) কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (২ খণ্ড), কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স,

3. A. S. Altekar (1949/1992) State and Government in Ancient India. Delhi, Motilal Banarasidass.

4. L. N. Rangarajan : (1987/1992) The Arthasastra, Delhi, Penguin Books , India,

5. R. P. Kangle : (1972/1988) Kautiliya Arthasastra, Vol. I, II, III, Delhi, Motilal Banarasidass,

6. U. N. Ghosal : (1959) A History of Indian Political Ideas, Bombay, O.U.P.,

একক ৩৪ ☐ মহাভারতের শান্তিপর্বের রাজনৈতিক ধারণাসমূহ

গঠন

৩৪.০ উদ্দেশ্য

৩৪.১ প্রস্তাবনা

৩৪.২ শান্তিপর্ব পরিচিতি

৩৪.৩ দণ্ডনীতিশাস্ত্র ঃ সংজ্ঞা

৩৪.৩.১ দণ্ডনীতিশাস্ত্র ঃ রচনার কারণ

৩৪.৩.২ দণ্ডনীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু

৩৪.৪ রাষ্ট্রের উদ্ভব

৩৪.১ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে প্রথম মত

৩৪.২ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে দ্বিতীয় মত

৩৪.৩ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে বক্তব্যের মূল্যায়ন

৩৪.৫ রাজধর্ম ঃ রাজার অধিকার ও কর্তব্য

৩৪.৫.১ রাজাকে মেনে চলার কারণ

৩৪.৫.২ বিদ্রোহ

৩৪.৬ রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকারভেদ ঃ গণরাজ্য

৩৪.৭ রাষ্ট্রের প্রকৃতি বা উপাদানসমূহ ঃ সপ্তাঙ্গতত্ত্ব

৩৪.৭.১ রাজা

৩৪.৭.২ মন্ত্রী

৩৪.৭.৩ কোষ

৩৪.৭.৪ দণ্ড

৩৪.৭.৫ মিত্র

৩৪.৭.৬ পুর বা দূর্গ

৩৪.৮ অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক

৩৪.৮.১ সন্ধি

৩৪.৮.২ যুদ্ধ

৩৪.৯ সারাংশ

৩৪.১০ অনুশীলনী

৩৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৩৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি মহাভারতের শান্তিপর্বকে অবলম্বন করে প্রাচীন ভারতের রাজনীতিচর্চার বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে। এই এককটির মাধ্যমে আমরা যে সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারব তা হ'ল—

(১) প্রাচীন ভারতে 'বিশেষ করে শান্তিপর্বের সময়ে' রাজনীতিচর্চার বিষয় ও ধরন কী রকম ছিল।

(২) রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে রাজতন্ত্রের প্রকৃতি কীরকম ছিল; অন্য কোনও রাজৈনৈতিক ব্যবস্থা ছিল কিনা;

(৩) রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে সে যুগের মানুষের ভাবনা-চিন্তা কেমন ছিল;

(৪) রাজার পদটির স্বরূপ; রাজার অধিকার ও কর্তব্যসমূহ;

(৫) রাজাকে মেনে চলার কারণ কী কী;

(৬) রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদান বা প্রকৃতিগুলি কী কী;

(৭) এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের সম্পর্ক কেমন ছিল;

(৮) এই সমস্ত বিষয়গুলি জানার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আজকের রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে তাকাব এবং দেখব আজকের যুগে ঐ সমস্ত বিষয়গুলির কোনও গুরুত্ব আছে কিনা। আমাদের আজকের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে এই আলোচনা থেকে কোনও সাহায্য পেতে পারি কিনা সে বিষয়ে আমরা ধারণা করতে পারব।

৩৪.১ প্রস্তাবনা

প্রাচীন ভারতের রাজনীতিপর্বের অন্যতম আকর গ্রন্থ হ'ল মহাভারত। ১৮টি পর্বে বিভক্ত এবং মহাকাব্য হিসেবে পরিচিত এই বিশাল গ্রন্থের দ্বাদশ পর্বটি হ'ল শান্তিপর্ব। শান্তিপর্বে বর্ণিত রাজনৈতিক ধারণার বিশ্লেষণই আমাদের মূল লক্ষ্য। পণ্ডিতগণ মনে করেন, সুবিশাল মহাভারত গ্রন্থটি আঠশো বছরেরও বেশী সময় ধরে সংকলিত হয়েছে। প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ বছর থেকে খ্রীষ্টাব্দ ৪০০ বছর পর্যন্ত সময় ধরে চলে এই গ্রন্থের বিস্তার।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটিতে আমরা রাজনীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলি একজায়গায় সুশৃঙ্খলভাবে আলোচিত হ'তে দেখেছি। কিন্তু মহাভারতের অন্যান্য পর্বের মতো শান্তিপর্বেও রাজনীতিচর্চার বিষযগুলি বিভিন্ন অধ্যায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কোনও নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনাম দিয়ে আলোচনা না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপদেশছলে এই বিষয়গুলি উল্লেখিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপদেশ দিচ্ছেন পিতামহ ভীষ্ম পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরকে। এছাড়া অন্যান্যদের কাছ থেকেও উপদেশ হিসেবে বিষয়গুলি এসেছে। কখনও দেবতা, কখনও মানুষ, কখনও অন্যান্য জীবজন্তুর কথোপকথন, প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রকাশ করা হয়েছে।

আমরা প্রথমে রাজনীতিশাস্ত্র হিসেবে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের উদ্ভব ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব। পরে দেখব রাষ্ট্রের সৃষ্টির পিছনে কোন্ কোন্ কারণ রয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে রাষ্ট্র সৃষ্টি ও রাজতন্ত্রের উদ্ভবকে সমানভাবে দেখার জন্য রাজতন্ত্র, রাজার অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়গুলি আমাদের আলোচনায় স্থান পাবে। রাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল কিনা সে সম্পর্কে জানাও আমাদের লক্ষ্য থাকবে। রাজ্য সম্পর্কে কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গতত্ত্বের আলোচনার মতো কোনও সুশৃঙ্খল আলোচনা না থাকলেও রাজা, অমাত্য, কোষ, দূর্গ, মিত্র প্রভৃতি বিষয়গুলি শান্তিপবের বিভিন্ন জায়গায় আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত অংশগুলিকে নিয়ে আমরা বিষয় অনুসারে সাজিয়ে নেব। সবশেষে আমরা দেখব, সে যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক কিভাবে পরিচালিত হ'ত। প্রসঙ্গে আমরা সন্ধি ও যুদ্ধ এই দু'টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেব। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক চর্চার উপর আলোচনা করতে গিয়ে যেহেতু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও মহাভারতের শান্তিপর্বকে বাছাই করা হয়েছে সেহেতু শান্তিপর্বের আলোচনায় কৌটিল্যের ধারণাও প্রসঙ্গক্রমে এসে যাবে। এসময়ে রাজনৈতিক ধারণার পিছনে কীধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল, সমাজ পরিবর্তনের ধরনই বা কীরূপ---এই প্রশ্নগুলি মাঝে মাঝে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে।

৩৪.২ শান্তিপর্ব পরিচিতি

প্রাচীনভারতের রাজনীতিচর্চার অন্যতম আকরগ্রন্থ হিসেবে সুবিশাল মহাকাব্য মহাভারতের নাম উল্লেখ করা যায়। ১৮টি পর্বে বিভক্ত এই মহাকাব্যটির বিভিন্ন পর্বে রাজনীতিচর্চার নিদর্শন থাকলেও রাজনীতির বিষয়সমূহ যেমন স্থান পেয়েছে; ধর্ম, নীতি, সমাজ, সংসার প্রভৃতি বিষয়গুলিও আলোচিত হয়েছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন উপাখ্যান যা মহাভারতের আয়তনকে আরোও বাড়িয়ে তুলেছে। আনুমানিক ৮০০ বছর ধরে এটি সংকলিত হয় বলে অনেকের ধারণা। প্রথম পর্বেই (আদিপর্ব) মহাভারতকে ইতিহাস, কাব্য, পুরাণ, সংহিতা, বেদ, পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র, শ্রুতিরূপ জ্যোৎস্না প্রভৃতি বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আদিপর্বের ৫৬ অধ্যায়ে ২১ নং শ্লোকে মহাভারত নিজেকে অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র বলে পরিচয় দিয়েছে। সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতে, মহাভারত শাস্ত্রগ্রন্থ ও ইতিহাসরূপেই পরিচিত হ'তে চেয়েছে, কারণ তখনকার ভারতবর্ষ জ্ঞান ও উপলব্ধির যে দু'টি প্রকাশকে চিনত---শাস্ত্র ও ইতিহাস, সে দু'টি আখ্যাই সে মহাভারতকে দিয়েছে। বুদ্ধদেব বসুও মহাভারতকে কোনও গোষ্ঠীগত, গুহাবদ্ধ, ধর্মপুস্তক হিসেবে না দেখে ভারতভূমিতে উদ্ভূত সবগুলি চিন্তাধারার মিশ্রণ হিসেবে দেখেছেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় আমরা দেখেছি রাজনীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলি একজায়গায় সুশৃঙ্খলভাবে আলোচিত হ'তে। কিন্তু মহাভারতের অন্যান্য পর্বের মতো শান্তিপর্বেও রাজনীতির বিষয়গুলি বিভিন্ন অধ্যায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কোনও নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনাম দিয়ে আলোচনা না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপদেশের ছলে রাজনীতির বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। এখানে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতো বিতর্কের মধ্য দিয়ে নয়, পারস্পরিক মত খণ্ডনের মাধ্যমে নয়, বক্তা ও শ্রোতার পরিবেশে রাজনৈতিক বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। সেদিক থেকে কৌটিলের অর্থশাস্ত্রের কাঠামো বিন্যাস ও শান্তির্বের কাঠামো-বিন্যাস ভিন্ন। এর ফলে, একই বিষয়ে বিভিন্ন অধ্যায়ে বক্তব্যের ভিন্নতাও মাঝে মাঝে ধরা পড়ে।

৩৪.৩ দণ্ডনীতিশাস্ত্র ঃ সংজ্ঞা

কৌটিল্যের রাজনীতি-চিন্তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি বর্তমান যুগে রাজনীতিবিজ্ঞান বলতে যা বোঝায় কৌটিল্য তাকে অর্থশাস্ত্র বা দণ্ডনীতি শাস্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন। মহাভারতের শান্তিপর্বেও রাজনীতিবিজ্ঞানকে দণ্ডনীতিশাস্ত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শান্তিপর্বের ৫৯নং অধ্যায়ে একটি আখ্যানের মধ্য দিয়ে দণ্ডনীতি শাস্ত্রের সংজ্ঞা, উদ্ভবের কাহিনী ও বিষয়বস্তু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। রাজা বা রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেই দেবতা ব্রহ্মা এই দণ্ডনীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তারপর এই শাস্ত্রের প্রয়োগকর্তা হিসেবে রাজাকে মনোনীত করেন। জগতে দণ্ডবিধানের জন্য প্রয়োজন কতকগুলো নীতির—যা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করবে। ৭৮নং শ্লোকে বলা হয়েছে, রাজা এই শাস্ত্রানুসারে প্রজাদের মধ্যে দণ্ডবিধান করবেন বলে বা দণ্ডের দ্বারা জগৎকে সৎপথে স্থাপন করবেন বলে এই শাস্ত্র দণ্ডনীতি নামে বিখ্যাত হবে। এই শাস্ত্র ত্রিভূবনে সব জায়গাতেই বিস্তার লাভ করবে। প্রথমে এই শাস্ত্রের অধ্যায় সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। দেবতা মহাদেব প্রথম এই দণ্ডনীতিশাস্ত্র ব্রহ্মার কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং মানুষের আয়ু কম বলে ব্রহ্মার রচিত এই দণ্ডনীতিশাস্ত্র দশ হাজার অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত করেন। এর পর ভগবান ইন্দ্র যথাক্রমে পাঁচ হাজার অধ্যায়ে, বৃহস্পতি তিন হাজার অধ্যায়ে এবং শুক্রাচার্য এক হাজার অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত করেন। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন অর্থশাস্ত্র বা দণ্ডনীতিশাস্ত্রটির রচয়িতা হিসেবে বিষ্ণুগুপ্তের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটির শেষে। মহাভারতের শান্তিপর্বে দণ্ডনীতিশাস্ত্রটির রচয়িতা এবং পরবর্তীকালের সংকলন হিসেবে দেবতাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে মহাভারতের যুগে মানবিক মূল্যবোধ ও নীতিগুলি, সামাজিক অনুশাসনগুলি মেনে চলার জন্য ধর্মের দোহাই দেওয়া শুরু হয়েছে। দেবতাকে এর স্রষ্টা বলা হয়েছে যাতে করে মানুষ এগুলি মেনে চলে।

৩৪.৩.১ দণ্ডনীতিশাস্ত্র রচনার কারণ

আমাদের মনে হ'তেই পারে হঠাৎ ভগবান ব্রহ্মা দন্ডনীতিশাস্ত্র রচনা করতে গেলেন কেন? শান্তিপর্বের ৫৯ অধ্যায় ভগবান ব্রহ্মা কর্তৃক দণ্ডনীতিশাস্ত্র রচনার কারণটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সত্যযুগে (আমরা জানি ভারতীয় দর্শনে সৃষ্টির ইতিহাসকে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চার যুগে ভাগ করা হয়) পৃথিবীতে প্রথমে রাজ্য, রাজা, দণ্ড, শাসক, শাসিত বলে কিছু ছিল না। মানুষ কতকগুলি নীতি নিয়মকে অনুসরণ করে চলত। কিন্তু ক্রমে মানুষের মধ্যে মোহের জন্ম হওয়ায় ক্রমশ জ্ঞান ও ধর্মের লোপ পায় এবং এর ফলে মানুষ লোভী, পরের ধন গ্রহণকারী, কামপরায়ণ, বিষয়সম্পত্তিতে আসক্ত ও কাজ-অকাজ বিবেকশূন্য হয়ে ওঠে। তখন দেবগণ অত্যন্ত শংকিতমনে ব্রহ্মার কাছে হাজির হয়ে বলেন, লোভ, মোহ ইত্যাদি নীচ বৃত্তিসমূহ নরলোকে বা মর্ত্যে (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল—এই তিন লোক বা ত্রিভূবন নিয়ে বিশ্ব গঠিত বলে প্রাচীন ভারতীয়রা মনে করতেন) সনাতন বেদ গ্রাস করাতে আমরা ভীত হয়েছি। বেদ ধ্বংস হওয়াতে ধর্মও বিনষ্ট হয়েছে। এর ফলে আমরাও মানুষের মতো হয়ে পড়ছি। মানুষ আমাদের (দেবগণের) উদ্দেশ্যে মর্ত্য থেকে আকাশ পথে হোমের আহুতি পাঠাতো এবং আমরা (দেবতারা) স্বর্গ থেকে মর্ত্যে হোমের ফলস্বরূপ বৃষ্টি বর্ষণ করতাম। কিন্তু এখন মানুষ আর হোম না করায় আমাদের (দেবতাদের) খাদ্যের

অভাব হচ্ছে। এতএব যাতে এই প্রাকৃতিক নিয়মের ধ্বংস না হয় তার জন্য আপনি নিজবুদ্ধি বলে এক উপায় স্থির করুন (১২/৫৯/১৪-২৭)।

দেবতাদের কাছ থেকে এভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মা প্রথমে দণ্ডনীতিশাস্ত্র রচনা করেন। এই শাস্ত্রের দ্বারা যেহেতু জগতের যাবতীয় লোকজন দণ্ড-প্রভাবে নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে সেহেতু এই শাস্ত্রের নাম দণ্ডনীতিশাস্ত্র (১২/৫৯/৭৮)। এই শাস্ত্রকে আবার অন্যতম ধর্মশাস্ত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে; কারণ, এই শাস্ত্র দ্বারাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয়। ধর্মের অন্য নাম বৃষ। কারণ বৃষ শব্দটি এসেছে বৃষ ধাতু থেকে যার অর্থ হ'ল বর্ষণ বা সৃজন করা। ধর্ম দ্বারাই সমাজ-সৃজন সম্ভবপর হয় বলে ধর্মের তথা দণ্ডের অপরনাম বৃষ। ১১২ অধ্যায়ে ২৫ নং শ্লোকে অবশ্য দেবী সরস্বতীকে দণ্ডনীতির রচয়িতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানেও দণ্ডনীতিশাস্ত্রের উদ্ভবের কারণ প্রজাদের ঔদ্ধত্য থেকে রক্ষা করার জন্য। সেটা জগৎকে নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ রাখার জন্য, প্রজাদের মধ্যে বর্ণসঙ্কর বন্ধ করার জন্য (এ কারণটি ৫৯ অধ্যায়ে বলা হয়নি) বলা হয়েছে।

উপরের এই আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় জানতে পারি ঃ (১) রাষ্ট্র বা রাজা সৃষ্টির মানুষ অরাজক অবস্থায় বাস করত।

(২) এই অরাজক অবস্থা কিন্তু বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিলনা, কারণ এই অরাজক অবস্থাতেও কতকগুলো নিয়ম মানুষ মেনে চলত; ফলে বেদ ও ধর্ম রক্ষা পেত।

(৩) ক্রমশ মানুষ লোভী হওয়ায়, বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে আসক্ত হওয়ায়, বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(৪) এই বিশৃঙ্খল অবস্থার ফলে দেবতাদেরও অসুবিধা হয়, কারণ মানুষ দেবতাদের প্রতি হোম নিবেদন না করায় দেবতাদের অন্নাভাব দেখা দেয়।

(৫) দেবতাদের এই অন্নাভাব দূর করার জন্য দেবতাদের কাছ থেকে অনুরুদ্ধ হয়ে ভগবান ব্রহ্মা দণ্ডনীতিশাস্ত্রের রচনা করেন। পরে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের প্রয়োগকারী হিসেবে রাজাকে মনোনীত করেন। অন্যভাবে বলা যায়, রাজার বা শাসকের অন্নাভাব থেকে রাজা বা শাসককে মুক্ত করার জন্যই দণ্ডনীতিশাস্ত্র। এই রূপকটির মধ্যে দিয়ে শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্ক, কর্তৃত্বের উদ্ভব প্রভৃতি বিষয়গুলি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষের কাছ থেকে পাওয়া হোম, আহুতি যেমন দেবতাদের খাদ্যের যোগান, সেরূপ প্রজাদের কাছ থেকে কর বা খাজনা রাজার খাদ্য যোগান দেয়। শাসক ও শাসিতের এই সম্পর্কটিকে বজায় রাখার জন্য তাই দণ্ডনীতিশাস্ত্রের একান্ত প্রয়োজন।

৩৪.৩.২ দণ্ডনীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু

শান্তিপর্বের ৫৯ অধ্যায়ে ২৯ নং শ্লোক থেকে ৭৯ নং শ্লোক পর্যন্ত ৫১টি শ্লোকে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি শ্লোকে আবার বিষয়বস্তুর সংখ্যা এক বা একাধিক। এর ফলে, দণ্ডনীতিশাস্ত্রে যে বিষয়বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে তা সুবিশাল; ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় দিকই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ আমরা এখানে করব।

(১) দণ্ডের উদ্ভব, স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনা।

(২) রাষ্ট্রের উদ্ভব, প্রকৃতি।

(৩) রাজপদের উদ্ভব, রাজার গুণ, দায়িত্ব।

(৪) রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদান---সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব, রাষ্ট্রের কার্যাবলী।

(৫) সমাজের স্তরবিন্যাস, স্তর-বিন্যস্ত সমাজে প্রতিটি বর্ণের দায়িত্বও কর্তব্য।

(৬) সন্ধি, সন্ধির প্রকারভেদ।

(৭) যুদ্ধ---যুদ্ধ পরিচালনার নীতিসমূহ, যুদ্ধ-কৌশল।

(৮) রাজার সৈন্যবল (যা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতো শাস্তিপট ও দণ্ড নামে অভিহিত)।

(৯) মন্ত্রণার প্রয়োজন, প্রকৃতি।

(১০) অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনার নীতিসমূহ।

(১১) শাসনকার্য পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগ।

(১২) ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রকৃতি।

(১৩) ৭২ প্রকার শারীরিক চিকিৎসা---বিভিন্ন দেশ, জাতি ও কুলের বিবরণ ও ধর্ম।

(১৪) কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়।

উপরের এই সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকেই বোঝা যায়, আমাদের যুগের রাজনীতিচর্চার যে আলোচ্য বিষয় তার তুলনায় প্রাচীন ভারতের রাজনীতিচর্চার বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা কোনও অংশেই কম ছিল না।

৩৪.৪ রাষ্ট্রের উদ্ভব

মহাভারতের শান্তিপর্ব পরিচিতিতে আমরা দেখেছি আটশো বছরেরও বেশী সময় ধরে মহাভারতের সংকলনের কাজটি চলতে থাকে। এর ফলে, মহাভারতের আয়তন যেমন বাড়ে বিভিন্ন সময়ে সংযোজনের ফলে কোনও বিষয়ের উপর একাধিক মতও লক্ষ্য করা যায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে শান্তিপর্বের বিভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্যের উপস্থিতি। বিভিন্ন অধ্যায়ে রাষ্ট্রের উদ্ভবের বিষয়টি আলোচিত হ'লেও ৫৯ এবং ৬৭ নং অধ্যায় দু'টি এ ব্যাপারে বিশেষ, গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই অধ্যায়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং রাজতন্ত্রের উদ্ভবকে সমার্থক হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাছাড়া, উভয় অধ্যায়েই রাষ্ট্রের তথা রাজতন্ত্রের উদ্ভবের পূর্বেকার অবস্থাকে অরাজক অবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সর্বোপরি, উভয় অধ্যায়েই রাষ্ট্র তথা রাজতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ হিসেবে ধর্ম তথা দণ্ডনীতি (রাজনীতি)কে রক্ষা ও প্রয়োগের বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে। এই মিলগুলি থাকা সত্ত্বেও উভয় অধ্যায়ের মধ্যে বেশ কিছু ব্যাপারে বক্তব্যের পার্থক্য থাকায় আমরা দু'টি অধ্যায়ের মতই আলোচনা করব।

৩৪.৪.১ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে প্রথম মত

শান্তিপর্বের ৫৯ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে রাজা পদটির উদ্ভবের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নটি ছিল খুবই সরল। যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করেন, রাজার হাত, পা, ঠোঁট, পিঠ, মুখ, রক্ত, মাংস, নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, ইন্দ্রিয়, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মরণ সব কিছুই প্রজাদের মতই। তবে রাজা কীরূপে একাকী অসংখ্য বিশিষ্ট, বুদ্ধিসম্পন্ন, মহাবল, পরাক্রান্ত মানুষের ওপর আধিপত্য বজায় রেখে গোটা পৃথিবী পালন করতে সমর্থ হন? এই প্রশ্নের উত্তরে পিতামহ ভীষ্ম রাজতন্ত্রের তথা রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ বিশ্লেষণ করেন। ভীষ্ম বলেন, প্রথমে রাজ্য, রাজা, দণ্ড তথা শাসক ও দণ্ডার্হ ব্যক্তি তথা শাসিত বলে কিছু ছিল না। মানুষ কতকগুলি নিয়ম তথা ধর্ম অনুসরণ করে জীবন কাটাত। কিন্তু এভাবে কিছুদিন কাটানোর পর শেষে নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ কষ্টকর হয়ে উঠল; কারণ, এসময় মানুষ ক্রমশ মোহে আচ্ছন্ন হ'তে থাকে এবং মোহ মানুষের জ্ঞান ও ধর্মকে নষ্ট করে। ফলে, মানুষ ক্রমেই লোভী, অপরের ধন আত্মসাৎ করতে আগ্রহী, কামপরায়ণ, ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে পড়ে। এভাবে বেদ ও ধর্ম বিনষ্ট হ'লে দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা এভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য একলক্ষ অধ্যায়যুক্ত এক নীতিশাস্ত্র রচনা করেন। এই শাস্ত্র দ্বারা মানুষ যেহেতু দণ্ডপ্রভাবে নিজ নিজ লক্ষ্য সাধনে এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সম্ভবপর হবে, সেকারণে এই নীতিশাস্ত্রটি দণ্ডনীতিশাস্ত্র নামে অভিহিত হয়। বলাবাহুল্য; শান্তিপর্বে ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র, ও দণ্ডশাস্ত্রের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয়নি। ব্রহ্মা যে দণ্ডনীতিশাস্ত্র রচনা করলেন সেই শাস্ত্র ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়ে এক হাজার অধ্যায়-যুক্ত হয়। এই একহাজার অধ্যায়যুক্ত দণ্ডনীতিশাস্ত্র রক্ষা ও প্রয়োগের জন্য ভগবান বিষ্ণু বিরজা নামে এক মানসপুত্র সৃষ্টি করেন। কিন্তু বিরজা রাজ্যপালনের বা রাজা হওয়ার পরিবর্তে সন্ন্যাস ধর্মে অনুরক্ত হ'লে তার পুত্র কীর্তিমান-এর উপর এই ভার পড়ে। কিন্তু, কীর্তিমান ও কীর্তিমানের পুত্র কর্দম রাজ্যভার নিতে অসম্মত হন এবং তপস্যাকেই প্রধান ব্রত হিসেবে নেন। কর্দমের পুত্র অনঙ্গ দণ্ডনীতি বিশারদ ও প্রজাপালনে তৎপর ছিলেন। কিন্তু, অনঙ্গের মৃত্যুর পর তার পুত্র অতিবল সুশাসক ছিলেন না। কারণ, তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়ের প্রতি আসক্ত। অতিবল-এর পুত্র বেন যথাযথভাবে ধর্ম তথা দণ্ডনীতিশাস্ত্র প্রয়োগে ব্যর্থ হওয়ার মহর্ষিগণ মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা বেনকে হত্যা করেন। এরপর উক্ত মহর্ষিগণ মন্ত্রপ্রভাবে বেন এর দক্ষিণ উরু ভেদ করাতে এক খর্বাকার, তাম্রলোচন ও দগ্ধকাষ্ঠের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের এক মানুষ জন্ম নিলে মহর্ষিগণ 'এই স্থানে নিষন্ন হও' বলে আদেশ করলেন। এই মানুষেরই বংশধরগণ পর্বত; বনবাসী নিষ্ঠুর প্রকৃতির ব্যাধ নিষাদ নামে পরিচিত হন। মহর্ষিগণ পুনরায় বেন এর দক্ষিণ হস্ত ভেদ করলে এক খড়্গ কবচধারী দণ্ডনীতিকুশল ইন্দ্রের ন্যায় পরম পুরুষ জন্ম নিলেন। ঐ ব্যক্তিই পৃথু নামে পরিচিত। এই পৃথুর উপরই দেবতা ও মহর্ষিগণ রাজ্যপরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। পৃথু যথাযথভাবে দণ্ডনীতিশাস্ত্র অনুসারে প্রজারঞ্জন করতেন বলে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ব্রাহ্মণগণকে ক্ষত বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতেন বলে ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হন (১২/৫৯/১২৫-১২৬)।

৩৪.৪.২ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে দ্বিতীয় মত

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে দ্বিতীয় ধারণাটি পাই শান্তিপর্বের ৬৭তম অধ্যায়ে। এই অধ্যায়েও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত করেছেন। এখানে বলা হয়েছে, রাজ্য-মধ্যে রাজাকে

অভিষিক্ত করাই প্রধান কর্তব্য, কারণ রাজ্য অরাজক ও বলশূন্য হ'লে দস্যুরা তা আক্রমণ করে; ধর্মের অবলুপ্তি ঘটে এবং প্রজারা পরস্পরের সঙ্গে হিংসায় লিপ্ত হয়। উপমা দিয়ে বলা হয়েছে, যদি পৃথিবীর মধ্যে রাজা দণ্ড ধারণ না করেন তাহলে জলের মধ্যে বড় মাছেরা যেমন ছোট ছোট মাছগুলিকে খেয়ে ফেলে সেরূপ বলবান ব্যক্তিরা দুর্বল ব্যক্তিদের উপর অত্যাচার করবে। এভাবেই প্রথমে পৃথিবী যখন রাজাহীন ছিল তখন মানুষ পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করতে শুরু করে। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলাও নষ্ট হয়। এসময় কয়েকজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি একজায়গায় সমবেত হয়ে এই নিয়ম স্থির করলেন যে, যে ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাষী, উগ্রস্বভাবের ও পরের সম্পদ অপহরণের চেষ্টা করবে আমরা সেইসব মানুষদের পরিত্যাগ করব। এভাবে নিয়ম নির্ধারণের পর কয়েকদিন ভালোভাবে চললেও এই নিয়ম অনুসরণ ও বলবৎ করার ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দেয়। তখন সবাই মিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে ঃ "আমরা রাজার অভাবে বিনষ্ট হচ্ছি; অতএব আপনি আমাদের একজন রাজা ঠিক করে দিন। আমরা সকলে তাকে পূজা করব এবং তিনিও আমাদের প্রতিপালন করবেন"। এভাবে সকলে ব্রহ্মাকে অনুরোধ করলে ব্রহ্মা মনুকে রাজা হিসেবে নিযুক্ত করেন। কিন্তু মনু এই দায়িত্বভার নিতে অস্বীকার করেন। কারণ রাজ্যশাসন বিশেষ করে মিথ্যাপরায়ণ মানুষকে স্বধর্মে স্থাপন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর জন্য রাজাকে পাপকাজও করতে হ'তে পারে যা মনুর পক্ষে করা সম্ভব নয়। কিন্তু যখন মানুষেরা মনুকে করপ্রদানে (পশু ও সোনার পঞ্চাশভাগের একভাগ এবং ধানের দশ ভাগের এক ভাগ), কন্যাপ্রদানে (বিরোধ, দ্যূতক্রীড়া ও শুল্ক প্রসঙ্গে অপরাধী হ'লে) যোদ্ধা প্রদানে (যারা অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ ও বাহনে প্রধান) এবং ধর্মের (প্রশাসন কর্তৃক অনুষ্ঠিত ধর্মের চারভাগের এক ভাগ পূণ্য) ভাগ দিতে স্বীকৃত হ'লেন, তখন মনু রাজ্যভার গ্রহণে ও ধর্ম অনুসারে প্রজাপালনে এবং পাপের শাস্তিদানের মাধ্যমে প্রজাদের নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত করার ব্যাপারে সম্মত হন।

৩৪.৪.৩ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে বক্তব্যের মূল্যায়ন

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে শান্তিপর্বের দু'টি অধ্যায় বর্ণিত এই দু'টি আখ্যানের মধ্যে বক্তব্যের ভিন্নতা থাকলেও কয়েকটি ব্যাপারে মতৈক্য দেখা যায়। যেমন, উভয় আখ্যানেই রাষ্ট্রের উদ্ভবের সঙ্গে রাজতন্ত্রের উদ্ভবের বিষয়টিকে এক করে দেখা হয়েছে। প্রজাদের অন্যতম কর্তব্যই হচ্ছে রাজ্য-মধ্যে রাজাকে স্থাপন করা। সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে কৌমতন্ত্র বা কৌমসাধারণতন্ত্র ছিল তার পরিবর্তে শান্তিপর্বে একমাত্র রাজতন্ত্রকেই কাম্য শাসনব্যবস্থা বলে স্বীকার করা হয়। দ্বিতীয়ত, উভয় আখ্যানেই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পূর্বের অবস্থাকে এক অরাজক অবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই অরাজক অবস্থার প্রকৃতি নির্ণয়ে অবশ্য উভয় আখ্যানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ৫৯ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে এসময় রাজ্য রাজা দণ্ড না থাকলেও মানুষ কতকগুলি নিয়মরীতি মেনে চলত। পরে মানুষ মোহাচ্ছন্ন হওয়ায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ৬৭ অধ্যায়ে বর্ণিত চিত্রটি ঠিক এর বিপরীত, অর্থাৎ প্রথমে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার কথা বলা হয়েছে; সেই বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষ এই নিয়ম স্থির করে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের তারা পরিত্যাগ করবে। এভাবে কিছুদিন চলার পর নিয়ম অনুসরণ করা ও বলবৎ করার ব্যাপারে তারা রাজার প্রয়োজন অনুভব করে। তৃতীয়ত, উভয় ক্ষেত্রেই রাজার মনোনয়ন দেবতাদের কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই রাজা প্রজাপালনে সমর্থ কিনা সেটাই ছিল প্রধান বিষয়। ৫৯নং অধ্যায়ের বর্ণনা

অনুযায়ী প্রথমে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের প্রবর্তন হয়; পরে সেই নীতিশাস্ত্রের ধারক ও বাহক হিসেবে রাজাকে বাছাই করা হয়। রাজা বেন যথাযথভাবে ধর্ম তথা দণ্ডনীতি প্রয়োগে অযোগ্য হওয়ায় মহর্ষিগণ তাকে ধ্বংস করেন। বস্তুত, বিভিন্ন অধ্যায়ে রাজার কর্তব্য ও রাজধর্মের বিষয়টি যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে রাজাকে প্রজাপালক হিসেবে দেখা হয়েছে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন-এর জন্যই তিনি দণ্ডনীতি অনুসারে দণ্ড প্রয়োগ করবেন। রাজা এক্ষেত্রে অছিস্বরূপ। চতুর্থত, ৫৯নং অধ্যায়ে লক্ষ্য করি বিরজার উপর রাজ্যপালনের দায়িত্বভার অর্পন করলে তিনি এই দায়িত্ব পালনে অসম্মত হন। ৬৭ অধ্যায়েও মনু প্রথমে রাজ্যের শাসন পরিচালনাকে পাপ কাজ বলে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু প্রজারা কর প্রদানে স্বীকৃত হ'লে ও আইন মানতে প্রতিশ্রুত হ'লে তবেই মনু রাজ্যভার নেন। করের ধরন অনুযায়ী বোঝা যায় সে সময় সমাজ ছিল মূলত পশুপালক ও কৃষি-ভিত্তিক সমাজ। সোনার ব্যবহার এক বাজারধর্মী অর্থব্যবস্থার অস্তিত্বকেও তুলে ধরে। তাছাড়া, রাজার রাজত্ব গ্রহণের পূর্বে প্রজাদের প্রতিশ্রুত হওয়ার বিষয়টি আনুগত্যের এক নতুন তাৎপর্য বহন করে। শান্তিপর্বের অন্যত্রও আমরা লক্ষ্য করি বানপ্রস্থে যাবার পূর্বে ধৃতরাষ্ট্র প্রজাদের কাছে অনুমতি নিচ্ছেন এবং নিজের ভুল কাজের জন্য ক্ষমা চাইছেন। রাজ্যের দায়িত্বভার নেবার আগেও রাজা মহর্ষিদের কাছে হাত জোড় করে বলছেন—'আপনারা উপযুক্ত মনে করে যে কাজ করতে আদেশ করবেন আমি সেই কাজই সম্পন্ন করব। সে ব্যাপারে আমার বিচার করা উচিত নয়' (১২/৫৯/১০২)। মহর্ষিগণও রাজাকে পরামর্শ দিলেন পৃথিবীতে সকলকেই ব্রহ্মরূপে পালন করতে, দণ্ডনীতিশাস্ত্র অনুসরণ করে চলতে, কখনও স্বেচ্ছাচারী না হ'তে, ব্রাহ্মণগণকে দৈহিক দণ্ডবিধান না দিতে এবং সকলকে বর্ণশঙ্কর থেকে রক্ষা করতে (১২/৫৯/১০১-১০৮)। রাজাও এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়ে রাজ্য শাসন পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন।

রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং রাজার দায়িত্ব নেবার ব্যাপারে শান্তিপর্বে আর একটি বিষয়ের বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি হ'ল—প্রজাদের স্বধর্মে স্থাপন করা ও বর্ণশঙ্কর বন্ধ করার বিষয়টি। শান্তিপর্বে আমরা সমাজের যে চেহারাটা পাই তা' চার বর্ণে বিন্যস্ত সমাজ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের মানুষ দ্বিজ বলে পরিচিত এবং বেদ অধ্যয়ন, দান ও যজ্ঞ করার অধিকারী। এই তিন বর্ণের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণরাই একমাত্র অপরকে বেদ অধ্যয়নের এবং যাজনের অধিকারী। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ ধর্মজনক হ'লেও যুদ্ধই অধিকতর ধর্মপথ। বৈশ্যের পক্ষেও দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ করার অধিকার থাকলেও পশুপালনই প্রধান ধর্ম। ঈশ্বর প্রজা সৃষ্টি করে তার মঙ্গলের ভার ব্রাহ্মণকে, প্রতিপালন এবং রক্ষার ভার ক্ষত্রিয়কে দিয়েছেন। বিধাতা পশু সৃষ্টি করে তার ভার দিয়েছেন বৈশ্যদের। সুতরাং পশুপালন ছাড়া অন্য কাজ বৈশ্যের ধর্মবিরুদ্ধ। বৈশ্য অন্যের পশুপালন করতেও পারেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি পশুপালনের পুরস্কার হিসেবে পশু/পশুর দুগ্ধের ভাগ পাবেন (১২/৫৯/৯-২৬)। ঈশ্বর শূদ্রকে উক্ত তিন বর্ণের দাস হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং, অন্য তিন বর্ণের সেবা করা শূদ্রের অন্যতম ধর্ম। এমনকি শূদ্রের কোনও প্রকার ধনসঞ্চয়ের অধিকারও নেই। উক্ত তিনবর্ণের ব্যবহৃত পোষাক ব্যবহার করতে এবং জীবিকার জন্য নির্ভরশীল হবে ঐ তিন বর্ণেরই উপর। এমনকি প্রভু কোনও বিপদে পড়লেও শূদ্র তার প্রভুকে পরিত্যাগ করবে না। বরঞ্চ কোনও কারণে প্রভু নিঃস্ব হয়ে পড়লে শূদ্র অন্য স্থান থেকে ধনসংগ্রহ করে তার প্রভুর ভরণপোষন করবে (১২/৫৯/২৮-৩৭)। অবশ্য দুর্ভিক্ষ, খরা প্রভৃতি আপৎকালীন সময়ে যখন বর্ণ অনুযায়ী কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা যায় না তখন বর্ণ অনুয়ায়ী কাজ না করলে কোনও দোষের হয় না। যেমন, এ সময় ব্রাহ্মণগণ

চুরি করলেও অগৌরবের হয় না। ১৪১ নং অধ্যায়ে বিশ্বামিত্র কর্তৃক এক চণ্ডালের ঘর থেকে কুকুরের মাংস চুরির কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে অনাহারে প্রাণত্যাগ ও অভক্ষ ভক্ষণপূর্বক প্রাণ রক্ষা করে ধর্মোপার্জন— এই দুয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি অবশ্য কর্তব্য এবং এতে কোনও দোষ হয় না (১২/১৪১/৮৬-৮৮)। অবশ্য এক্ষেত্রেও এক বর্ণগত নিয়ম ঠিক করা হয়েছে; যেমন, প্রথমে নিচুবর্ণের সম্পত্তি চুরি করা; কিন্তু নিচু বর্ণের মানুষের কাছে কিছু না পাওয়া গেলে তখনই নিজ বর্ণের কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি চুরি করা এবং এ ধরনের কাজ অন্যায় বলে বিবেচিত হবে না (১২/১৪১/৩৯-৪০)। ৪২ এবং ৪৭ নং শ্লোকে ব্রাহ্মণকেই অপর তিন শ্রেণীর স্রষ্টা বলা হয়েছে। অন্য জায়গায় প্রজাপতি ব্রহ্মার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে; যেমন ব্রহ্মার মাথা, হাত, পেট ও পা থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এই চার বর্ণ ছাড়াও শান্তিপর্বে বনবাসী, পাহাড়বাসী জনগোষ্ঠীর (যা ম্লেচ্ছ, নিষাদ, অসুর প্রভৃতি নামে পরিচিত) উল্লেখ রয়েছে।

আসলে বৈদিক সমাজ যখন এদেশীয় সমাজের সঙ্গে সংঘাত ও সমন্বয়-এর মধ্যে দিয়ে ক্রমশ স্তরবিন্যস্ত সমাজে রূপান্তরিত হ'তে থাকে তখন এই স্তরবিন্যস্ত সমাজে উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযোগহীন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণ সমাজের প্রধান শাসক রূপে বিবেচিত হয়। সেই সময়কার সমাজ যেহেতু মূলত পশুপালক ও কৃষি-সমাজ সেহেতু পশুর মালিক ও পালক হিসেবে এবং কৃষক হিসেবে বৈশ্যকেও সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু শূদ্ররা (যারা অধিকাংশই আর্যদের দ্বারা পরাজিত জনগোষ্ঠী) এই তিন বর্ণের দাস বা শুশ্রুষাকারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সব রকমের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত এই শূদ্রশ্রেণীর অবস্থানও তাই সমাজের একেবারে নিচুতলায়। এরকম এক সমাজকে রক্ষা করার জন্য তাই স্বাভাবিকভাবেই দরকার এক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র কর্তৃত্বের যা এই সমাজ বিন্যাসকে রক্ষা করবে এবং যাতে করে বিবাহ ইত্যাদির মাধ্যমে মিশ্রণ না ঘটে তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেবে। রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্র কর্তৃত্বের উদ্ভব তাই অত্যন্ত জরুরী এই বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে। রাষ্ট্রের উদ্ভবের আখ্যানগুলির মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এই চরম সত্যটাকেই তুলে ধরা হয়েছে।

৩৪.৫ রাজধর্ম, রাজার অধিকার ও কর্তব্য

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, দণ্ডনীতি অনুসরণ করে রাজধর্ম পালনই রাজার অন্যতম কর্তব্য। বস্তুত, শান্তিপর্বের প্রতিটি অধ্যায়েই রাজার ধর্ম ও কর্তব্য সম্পর্কে কোনও না কোনও উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত উপদেশাবলীর মধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশগুলিই প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই সমস্ত উপদেশগুলিতে রাজার ক্ষমতাকে অধিকার হিসেবে না দেখে কর্তব্য হিসেবেই দেখা হয়েছে। দণ্ডনীতির ধারক ও বাহক হিসেবেই রাজার সৃষ্টি। ৬৪তম অধ্যায়ের ৩০ নং শ্লোকে রাজধর্মকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণের ধর্মসাধনের মূল রাজধর্ম। অন্য তিন বর্ণের যাবতীয় ধর্ম ও লোকাচার রাজধর্মের দ্বারাই রক্ষিত হয়। উপমা দিয়ে বলা হয়েছে, যেমন সকল প্রাণীর পায়ের ছাপ হাতীর পায়ের ছাপে মুছে যায় সেরকম সমস্ত ধর্মই রাজধর্মে বিলীন হয়। ৫৯ অধ্যায়ের ১৪৪নং শ্লোকে রাজা ও দেবতাকে সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ৫৬ অধ্যায়ে আবার দেবতার তুলনায় রাজাকে প্রধান বলা হয়েছে। কারণ, দৈব্য ফলসিদ্ধি পরোক্ষ কিন্তু রাজক্ষমতা প্রত্যক্ষ ফল উৎপাদন করে ;

অর্থাৎ, দেবতা তুষ্ট বা রুষ্ট হ'লে আমরা বুঝতে পারি না, কিন্তু রাজা তুষ্ট বা রুষ্ট হ'লে তার ফল আমরা সরাসরি জানতে পারি।

আবার, অর্থশাস্ত্রের ন্যায় শান্তিপর্বেও রাজ্য ও রাজতন্ত্রকে সমার্থক হিসেবে দেখা হয়েছে। শান্তিপর্বে রাজতন্ত্র শুধুমাত্র মানুষের সমাজেই অপরিহার্য নয়। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল---এই ত্রিভুবনেও রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব রয়েছে। ১২২ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে দণ্ডনীতির সৃষ্টির পর মহাদেব ইন্দ্রকে দেবগণের, যমকে পিতৃগণের, কুবেরকে ধন ও রাক্ষসগণের, সুমেরুকে পর্বতসমূহের, সমুদ্রকে নদীকুলের, বরুণকে জল ও অসুরগণের , মৃত্যুকে প্রাণের, ভাস্কর ও হুতাশনকে তেজের, ঈশানকে রুদ্রগণের, বশিষ্টকে বিপ্রগণেব, নিশাকরকে নক্ষত্রমণ্ডলের, অংশুমানকে লতাজালের, কুমারকে ভুতগণের, কামকে মৃত্যু ও সুখ-দুঃখের এবং ক্ষুপকে সমুদয় মানুষের রাজা করেন।

শান্তিপর্বের ৫৭ নং অধ্যায়ে রাজার কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজার পক্ষে উদ্যোগী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি স্বামী (রাজা) অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, দেশ, দুর্গ ও সৈন্য---রাজ্যের এই সাতটি অঙ্গের বিরুদ্ধ আচরণ করবে সেই ব্যক্তি গুরুই হন বা মিত্রই হন, অবশ্যই রাজার বধ্য হবেন।

রাজার কর্তব্য সবসময় কোষাগারকে পরিপূর্ণ রাখা। তিনি ন্যায় বিচারে যম এবং ধনসংগ্রহে কুবের এর মতো হবেন। ৭১ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, রাজা প্রজাদিগের শস্যের ছয় ভাগের এক ভাগ এবং সুরক্ষিত বণিকদের দেওয়া ধন গ্রহণ করে অর্থসংগ্রহ করবেন (১২/৭১/১০)। লোভের বশবর্তী হয়ে রাজা কখনও ধনসঞ্চয় করবেন না। উপমা সহকারে বলা হয়েছে, দুগ্ধলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি গাভীর স্তনমণ্ডলকে কর্তন করলে যেমন দুগ্ধলাভে সমর্থ হয় না সেরূপ রাজা প্রজাদিগকে নিপীড়ন করলে কখনই সম্পত্তিশালী হ'তে পারে না (১২/৭১/১৬)।

৫৮ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, গুপ্তচর ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের বিরক্ত না করে যথাসময়ে বেতনদান, অসৎপথ অনুসরণ না করে যুক্তি অনুসারে প্রজাদের করগ্রহণ, প্রজাদের হিতসাধন, জীবন ও গৃহকে সুরক্ষিত করা প্রভৃতি কাজগুলি রাজা যত্ন করে করবেন (১২/৫৮/৫-১০)। অন্যান্য জনকল্যাণকর কর্মসূচীর কথাও বলা হয়েছে। যেমন, অনাথদের প্রতিপালন, বৃদ্ধদের শুশ্রুষা, দরিদ্র ও বিধবাদের জীবিকার ব্যবস্থা করা , সৎপাত্রে ধনদান, অসৎলোকের কাছ থেকে ধন সংগ্রহ করে সৎলোকেদের মধ্যে বিতরণ প্রভৃতি কাজগুলিও রাজার কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে (১২/৫৭/১৯-২৪)।

বিচারকার্য সম্পাদনের ব্যাপারে রাজা যথেষ্ট সতর্ক হবেন। বিনা বিচারে যেন কেউ শাস্তি না পায়, একের অপরাধে অন্য ব্যক্তি শাস্তি না পায়। একমাত্র বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেই কোনও ব্যক্তিকে শাস্তিদান অথবা মুক্তিদেওয়া---প্রভৃতি বিষয়গুলি রাজা দেখবেন। বিচারকালে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা রাজার কর্তব্য। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি নিরাশ্রয় হয় এবং তার যদি সাক্ষ্যবল না থাকে তাহ'লে তার বিষয়টি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা উচিত। বিচার করতে গিয়ে যার যেরূপ দোষ প্রমাণ হবে রাজা তার প্রতি সেরূপ শাস্তি দেবেন। অবশ্য, এ ব্যাপারে শান্তিপর্বে ধন ও বর্ণ বিশেষে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে বৈষম্যমূলক আচরণের কথাও বলা হয়েছে। যেমন, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ধনদণ্ড, নির্ধনদের কারাদণ্ড এবং দুর্বৃত্তদের দৈহিক

দণ্ড দ্বারা শাসন করা রাজার কর্তব্য। অথচ ব্রাহ্মণ যদি দোষী হয় তাহলে মৃদু তিরষ্কার করাই উচিত। অবশ্য ৫৬ নং অধ্যাযের ৩২ নং শ্লোকে অপরাধী ব্রাহ্মণকে হত্যা করার চেয়ে রাজ্য থেকে বের করে দেবার কথা বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণকে দৈহিক আঘাত করা যাবে তখনই যখন ধর্মপরায়ণ রাজা বেদ-বেদান্ত পারগ ব্রাহ্মণকে অস্ত্র নিয়ে আসতে দেখবেন। এরকম অবস্থায় ব্রাহ্মণকে নিগ্রহ করলেও অধর্মের হবে না। (১৩/৫৬/২৯)

বিজিত রাজার প্রতি বিজেতা রাজার কীরূপ ব্যবহার করা উচিত সে সম্পর্কে ৯৬ অধ্যায়ে কতকগুলি কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। যেমন, রাজার পক্ষে বিজয় বাসনা করা কর্তব্য কিন্তু যিনি নিজের মঙ্গল কামনা করবেন তিনি কোনও অধর্মের আশ্রয় নেবেন না। যুদ্ধে বর্ণহীন, অস্ত্রহীন ও শরণাগত রাজা/যোদ্ধাকে রাজা হত্যা করবেন না। এরকম ক্ষেত্রে রাজা সেই ব্যক্তিকে বন্দী করে এক বছর পর্যন্ত সময় ধরে অনুকূলে আনার চেষ্টা করবেন। কিন্তু এক বছর পর সেই ব্যক্তি অনুগত হ'তে অস্বীকার করলে রাজা তাকে মুক্তি দেবেন। শত্রুর কন্যার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম বলবৎ হবে। অর্থাৎ রাজা শত্রুকন্যাকে নিজগৃহে এনে নিজের স্ত্রী করার জন্য এক বছর ধরে উপদেশ দেবেন। কিন্তু এর মধ্যে যদি সেই রমণী স্ত্রী হতে রাজী না হন তাহলে তাকেও মুক্তি দেবেন (১২/৯৬/৪-৫)। বিজয়ী রাজার কর্তব্য হ'ল তিনি মধুর বাক্য বলে এবং যুদ্ধে অর্জিত বস্তুসকল অনার্য ম্লেচ্ছাদি সকল প্রজাদিগকে দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবেন। এই ব্যবস্থাকেই রাজার সর্বোত্তম নীতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে (১২/৯৬/১২)। যুদ্ধে যেহেতু অনেককেই হত্যা করতে হয় সেহেতু ক্ষাত্রধর্মকে সবচেয়ে পাপজনক ধর্ম বলা হয়েছে এবং এ কারণেই যুদ্ধ জয়ের পর যজ্ঞানুষ্ঠান, প্রজাদের দান ও সাধুসন্তদের অনুগ্রহ করে রাজার পাপস্খলনের কথা বলা হয়েছে (১২/৯৭/৯)।

রাজার অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটা প্রশ্ন আমাদের মনে বারবার আসে। সেই প্রশ্নটা হ'ল---রাজা (ক্ষত্রিয়) এবং ব্রাহ্মণ এই দুই ব্যক্তির (বর্ণের) মধ্যে কে বেশী প্রভাবশালী। বর্ণের বিন্যাস অনুযায়ী ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবস্থান সবার উপরে। ৭৩ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। রাজারও উচিত কোন ব্রাহ্মণকে প্রথমে পুরোহিত পদে অভিষিক্ত করে তবেই রাজ্যভার নেওয়া (১২/৭৩/২৯-৩১)। ব্রহ্মা প্রথমে ব্রাহ্মণকেই সৃষ্টি করেন এবং দণ্ডের ভার দেন। সেই দণ্ডের ভার ব্রাহ্মণ অর্পণ করে ক্ষত্রিয় হাতে। সুতরাং, এদিক থেকেও মনে হয়, ব্রাহ্মণের প্রাধান্যই বেশী। তাছাড়া, ব্রাহ্মণগণকে সকল প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন বলেই রাজা ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত (১২/৫৯/১২৫)। কিন্তু এরূপ বক্তব্যের পাশাপাশি বেশ কিছু বক্তব্য রয়েছে যা রাজার প্রাধান্যকেই প্রধান বলে প্রমাণ করে; যেমন, রাজাকে দেবগণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বলে কেহই রাজার আদেশ লঙঘন করে না। এই জগৎ একমাত্র রাজার অধীনেই থাকে। রাজার উপর জগতের শাসন চলে না (১২/৫৯/১৩৫)। ৫৬ নং অধ্যায়ে যদিও ব্রাহ্মণদের কখন ও দণ্ড দেওয়া উচিত নয় বলা হয়েছে (১২/৫৬/২২) কিন্তু ২৭ নং শ্লোকে ব্রাহ্মণকে নিজ বাহুবলে নিগ্রহ করার কথাও বলা হয়েছে, যদি রাজা দেখেন সেই ব্রাহ্মণ ত্রিলোক বিনাশ করতে উদ্যত হয়। ২৯নং শ্লোকে বলা হয়েছে কোনও ব্রাহ্মণ যদি যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে তাহলেও রাজা তাকে বধ করবেন। ৩২ নং শ্লোকে অবশ্য বলা হয়েছে অপরাধী ব্রাহ্মণকে হত্যা করার চেয়ে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করবেন। সুতরাং এই সমস্ত শ্লোকগুলি থেকে প্রমাণিত হয় রাজক্ষমতাই প্রধান।

রাজা ও ব্রাহ্মণ এই দু'য়ের মধ্যে কে প্রধান এই প্রশ্নে শান্তিপর্বে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য রযেছে এবং এই পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের জন্য কখনও রাজাকে কখনও ব্রাহ্মণকে প্রধান বলে মনে হয়। আমাদের মনে

হয় শান্তিপর্বে রাজা এবং ব্রাহ্মণ এই দু'য়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার বিচারের চেয়ে উভয়ের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার বিষয়েই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। রাজা (ক্ষত্রিয়) এবং ব্রাহ্মণের স্বার্থ পরস্পরের পরিপূরক। উভয় শ্রেণীই সমাজের উদ্বৃত্ত ভোগ-দখলকারী; প্রাধান্যকারী শ্রেণী। অন্যান্য শ্রেণীগুলির মধ্যে প্রাধান্য বজায় রাখতে গেলে তাই এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা ও বোঝাপড়া একান্ত জরুরী। ৭৩ নং অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটিতে তাই বলা হয়েছে---ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের উন্নতি সাধন করেন; আবার ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণের উন্নতি হয় (১২/৭৩/৩২)। আর স্বার্থ বোঝাপড়ার দায়িত্বটা শান্তিপর্ব রাজার উপরই অপর্ণ করেছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হলে প্রজাদের দুঃসহ দুঃখ দেখা দেয়— এটা জেনে রাজা অবশ্যই বহু বিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করবেন (১২/৭৩/২৮)।

৩৪.৫.১ রাজাকে মান্য করার কারণ

রাজার অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি প্রজাদের মঙ্গলসাধনই রাজার অন্যতম ধর্ম। রাজা দণ্ডনীতি অনুসারে শাসন করেন এবং প্রজারাও নিরাপদে জীবনযাপন করেন। কিন্তু প্রজারা রাজাকে মানতে বাধ্য হবে কেন? প্রশ্নটি আমাদের মনে যেমন রেখাপাত করে শান্তিপর্বেও এই প্রশ্নটি সম্পর্কে ৬৭ এবং ৬৮নং অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাজাকে মেনে চলার কারণ সম্পর্কে শান্তিপর্বের বক্তব্যকে আমরা এখন আলোচনা করব।

প্রথমত, রাষ্ট্রসৃষ্টির সময়েই প্রজারা রাজাকে মানবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি প্রথমে মনু রাজ্যের ভার নিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু প্রজারা কর, সৈন্য ইত্যাদি দিয়ে রাজাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলে তবেই মনু রাজপদে বসতে রাজী হন।

দ্বিতীয়ত, রাজাই প্রজাদের অরাজক অবস্থা থেকে মুক্ত করে প্রজাদের ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ সাধনের সহায়ক হন। এ কারণেই প্রজাদের প্রথম কর্তব্যই হ'ল রাজা হিসেবে একজনকে প্রতিষ্ঠিত করা। এমনকি, যে সমস্ত রাজ্যে রাজা ও সৈন্যসামন্ত থাকে না সেই রাজ্য অন্য কোনও রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হলে প্রজাদের উচিত সেই রাজাকে সম্মানপূর্বক গ্রহণ করা, কারণ অরাজক রাজ্যে বাস করার চেয়ে বেশী ক্ষতিকর আর কিছুই নেই (১২/৬৭/৬-৭)।

তৃতীয়ত, প্রজারা যদি রাজাকে সহজেই মেনে চলে তাহলে প্রজাদের রাজার উৎপীড়ন সহ্য করতে হয় না। উপমা দিয়ে বলা হয়েছে, যে গরুর দুধ দোহন করা কষ্টকর সেই গরু গোপালকের প্রহারে গুরুতর কষ্ট পায়। কিন্তু যে গরুর দুধ দোহন করার ব্যাপারে কষ্ট করতে হয় না সেই গরুকে প্রহারও সহ্য করতে হয় না (১২/৬৭/৯)।

চতুর্থত, রাজা প্রজাদের পাপ মোচন করেন। প্রজারা যে সমস্ত অন্যায় কাজ করে থাকে সেই অন্যায় কাজের জন্য প্রজাদের পাপ হয়। রাজা শাস্তিদানের মাধ্যমে প্রজাদের সেই পাপ লাঘব করেন (১২/৬৮/৯)।

পঞ্চমত, রাজাকে মেনে চলার কারণ হিসেবে রাজার প্রতি দেবত্বও আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

রাজা মানুষরূপী দেবতা। সুতরাং, রাজাকে মানুষ হিসেবে দেখা বা অবজ্ঞা করা উচিত নয়। রাজা প্রয়োজনবোধে অগ্নি, আদিত্য, মৃত্যু, কুবের ও যম --- এই পাঁচ মূর্তি ধারণ করতে পারেন (১২/৬৮/৪১)। যে প্রজা মনে মনেও রাজার অনিষ্ট চিন্তা করে তাকে নিঃসন্দেহে হইলোকে কষ্ট ভোগ ও পরলোকে নরকে যেতে হয়। (১২/৬৮/৩৯)।

৫৯নং শ্লোকে অবশ্য প্রজাদের গুরুত্বও উল্লেখ করা হয়েছে। রাজা প্রজাদের প্রধান শরীর; আবার প্রজারাও রাজার অতুলনীয় শরীর। রাজা ছাড়া যেমন রাজ্য হ'তে পারে না সেরূপ রাজ্য ছাড়াও রাজা হতে পারে না। রাজা যাতে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে না পারে তার জন্য রাজাকেও ধর্মের ভয় দেখানো হয়েছে---'রাজাও ইন্দ্রিয় দমন, সত্য ব্যবহারও প্রজারঞ্জন সহকারে পৃথিবী শাসন করে এবং প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠানের গুণে অত্যন্ত যশস্বী হয়ে স্বর্গলোকে স্থায়ী স্থান লাভ করেন (১২/৬৮/৬১)।

৩৪.৫.২ বিদ্রোহ

রাজাকে মেনে চলার জন্য অনেকরকমের উপদেশ দিলেও প্রজারা যে রাজার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে সে সম্পর্কে শান্তিপর্বের রচয়িতা যথেষ্ট সচেতন। এ কারণে প্রজা বিদ্রোহ ঘটলে রাজার কি করণীয় সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। শান্তিপর্বে দু'ধরনের বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে— আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ আবার তিন ধরনের হ'তে পারে (১) রাজার নিকট আত্মীয়, জ্ঞাতি গোষ্ঠী কর্তৃক বিদ্রোহ (২) অমাত্যগণ কর্তৃক বিদ্রোহ (৩) প্রজা বিদ্রোহ। ৮১নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে যদি রাজার জ্ঞাতিগোষ্ঠী দ্বারা বিদ্রোহ দেখা যায় তাহলে সেই বিদ্রোহ দমনে কষ্টসাধ্য কাজ করতে গিয়ে হয় বিপুল ধনক্ষয় নতুবা অসংখ্য লোকের প্রাণহানি হবে। সেক্ষেত্রে ক্ষমা, সরলতা, মৃদুতা প্রদর্শন, যথাশক্তি অন্নদান ও উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে রাজা সেই বিদ্রোহ দমন করবেন। এই পদ্ধতিকে 'অলৌহনির্মিত হৃদয় বিদারক মৃদু অস্ত্র' বলে শান্তিপর্বে উল্লেখ করা হয়েছে (১২/৮১/২১)।

যদি দেখা যায় অমাত্যগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তাহলে প্রথমেই অমাত্যগণকে দোষী সাব্যস্ত না করে রাজার উচিত ধীরে ধীরে অমাত্যগণের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া। তারপর অমাত্যদের সকলের দোষ একে একে প্রমাণ করে প্রত্যেককে বিনাশ করা উচিত। সকলের প্রতি একসঙ্গে দোষারোপ করলে সকল অমাত্য মিলিত হয়ে রাজশক্তিকে দুর্বল করতে পারে (১২/৮২/৬১) অমাত্যদের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়ে মন্ত্রীদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা উৎপাদন করে হীনবল করা এবং একজন দোষী অমাত্য দিয়ে অপর দোষী অমাত্যকে বিনষ্ট করা উচিত (১২/৮২/৬৩-৬৫)।

যদি কোনও কারণে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাহলে ব্রাহ্মণগণই রাজার প্রধান অবলম্বন হবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সাহায্য নিয়ে রাজা সে বিদ্রোহ দমন করবেন; কিন্তু বিদ্রোহ দমনের পরে বিদ্রোহী প্রজাদের সঙ্গে রাজা ভাল ব্যবহার করবেন ও মঙ্গল করবেন। কারণ, এর ফলে বিদ্রোহী প্রজাগণ ক্রমশ ধর্মসম্মত নিজ নিজ কাজে যুক্ত হবে (১২/৭৮/১৬-১৭)।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ছাড়াও রাজ্যে বাইরের শত্রুরা দেশের মধে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। এরকম হলে রাজা সমস্ত বর্ণের মানুষেরই সাহায্য নেবেন। এমনকি এ ক্ষেত্রে শূদ্রবর্ণের প্রজারাও অস্ত্রধারণে দোষী বলে বিবেচিত হবে না (১২/৭৮/১৮)।

কিন্তু যদি রাজা নিজেই অত্যাচারী হয়ে থাকেন তাহলে ব্রাহ্মণেরা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, অস্ত্র ও দৈহিক শক্তি দ্বারা অথবা কূটকৌশলে রাজাকে ধর্ম অনুযায়ী শাসন করতে বাধ্য করবে। এই ক্ষমতা একমাত্র ব্রাহ্মণরাই প্রয়োগ করবে। কারণ, ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে (১২/৭৮/২১)। এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার হ'ল ব্রাহ্মণদের অস্ত্র ধারণ নিষিদ্ধ হ'লেও এক্ষেত্রে অস্ত্রধারণকে বৈধ বলা হয়েছে। তাছাড়া, রাজার প্রতি ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য বর্ণের অস্ত্রধারণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কিন্তু ৭৮নং অধ্যায়ে ৩৮ থেকে ৪৪ নং শ্লোক বিশ্লেষণ করলে এক ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। এই শ্লোকগুলিতে উপরের অনুশাসনগুলি বজায় রাখা হয়নি। শূদ্রের অস্ত্রধারণকেও সমর্থন করা হয়েছে। এমনকি , শূদ্রের বা বৈশ্যের রাজা হওয়ার সম্ভাবনাকেও স্বীকার করা হয়েছে। বলা হযেছে, রাজা বা ক্ষত্রিয়গণ বিপথগামী হয়ে পড়লে যদি ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য এমনকি শূদ্র সম্ভূত কোনও বলবান ব্যক্তি সেই প্রতিকুল অবস্থার প্রতিকার করতে সমর্থ হয় এবং ধর্ম রক্ষার জন্য ধর্মানুসারে দণ্ড ধারণ করে অনিষ্ট সৃষ্টিকারী দস্যুদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে পারে তাহলে ক্ষত্রিয় না হয়েও সেই বলশালী ব্যক্তি এমনকি শূদ্র হ'লেও রাজার সম্মান পাবার যোগ্য (১২/৭৮/৩৮)। ভারবহনে অক্ষম বৃষের ন্যায় যে রাজা রাজ্য রক্ষা করতে পারে না সেই অক্ষম রাজার কোন প্রয়োজন নেই (১৩/৭৮/৪১)। উপমা সহকারে বলা হয়েছে, কাঠের হাতি কাজে অক্ষম পুরুষ, অনুর্বর জমি, নপুংসক মানুষ, বৃষ্টি দিতে ব্যর্থ মেঘ যেমন নিষ্ফল, সেরকম বেদপাঠে বিমুখ ব্রাহ্মণ ও রক্ষার কাজে অসমর্থ রাজা সকল দিক থেকে অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয় (১২/৭৮/৪২-৪৩)। অনাথ,, দুস্য দ্বারা অত্যাচারিত, বিভিন্ন কষ্টে জর্জরিত, ক্লিষ্ট মানুষ যে পুরুষ প্রধানকে আশ্রয় করে যথা সুখে জীবন যাপন করতে পারে সেই পুরুষ প্রধানকেই প্রজারা আপন বন্ধুর মতো মনে করবে ও শ্রদ্ধা করবে এবং সেই ব্যক্তিই রাজা সম্মান লাভের যোগ্য (১২/৭৮/৩৯-৪০)। যিনি সবসময় সৎব্যক্তিদের রক্ষা ও অসৎব্যক্তিদের শাস্তিদানের মাধ্যমে অসৎকাজ থেকে বিরত করতে পারেন সেই ব্যক্তিই রাজপদের যোগ্য; কারণ সেই ব্যক্তি দ্বারাই এই গোটা জগৎ সুরক্ষিত হয়ে থাকে ও সনাতন ধর্ম বজায় থাকে (১২/৭৮/৪৫) । এই শ্লোকগুলি থেকে মনে হয় অযোগ্য রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের অস্ত্রধারণকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হযনি। তাছাড়া ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্ররাও রাজপদের যোগ্য হ'তে পারে। সম্ভবত, এসময় পর্যন্ত বর্ণব্যবস্থার কড়াকড়ি চরম জায়গায় পৌঁছায়নি। নতুবা এরকম শ্লোকগুলি শান্তিপর্বে স্থান পেত কিনা সন্দেহ।

৩৪.৬ রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকারভেদ—গণরাজ্য

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতো শান্তিপর্বেও রাজতন্ত্রই প্রধান ও কাম্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা। রাজ্য এবং রাজাকে সমার্থক হিসেবেই দেখা হয়েছে। একারণে উভয় গ্রন্থেই রাজতন্ত্রের উদ্ভব, রাজার গুণ, কর্তব্য, যুদ্ধবিবাদ, নির্দেশ প্রভৃতিই মূল আলোচনার বিষয়। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতো শান্তিপর্বেও অন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে গণরাজ্য বা সংঘ রাষ্ট্রের উল্লেখ করা হয়েছে। শান্তিপর্বের ১০৫নং অধ্যায়ে এই গণরাজ্য বা সংঘরাজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, গণরাজ্যকে রাজতন্ত্রের এক বিপরীত বা ভিন্ন ব্যবস্থা হিসেবেই তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়টিতে গণরাজ্যের প্রকৃতি ও সুফল সম্পর্কে যেমন প্রশংসা করা হয়েছে, গণরাজ্যের ত্রুটিগুলি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

সংঘবদ্ধতা ও ঐক্যকেই গণরাজ্যের ভিত্তি বলা হয়েছে (১২/১০৫/১৪,১৮)। এই ঐক্যের ফলে রাজ্যের ক্ষমতা ও দৃঢ়তা বাড়ে। রাজ্য পরিচালনা সহজ বা এবং অভিষ্ট লক্ষ্যসমূহ পূরণ হয় (১২/১০৫/২০,২১) এবং সহজেই সংকটের মোকাবিলা করতে পারে। সংঘবদ্ধ লোকেদের মধ্যে সহযোগিতার ফলে রাজ্যের উন্নতি হয়। গণরাজ্যের সদস্যগণই গুপ্তচর বা দূতের কাজ, মন্ত্রণা করা, নিয়ম তৈরী করা, অর্থ সংগ্রহ করা---সব বিষয়েই উদ্যোগী হয় এবং সক্রিয় অংশ নেয় (১২/১০৫/১৯)। রাজতন্ত্রের ন্যায় গণরাজ্য যেহেতু বংশানুক্রমিক শাসন নয় সেহেতু গণরাজ্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সন্তান বা ভ্রাতারা যদি কোনও অন্যায় করে তাহলে তাদেরও শাস্তি পেতে হয়। জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষরাই রাজ্য পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা নেয়। সবসময় উপযুক্ত শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং শিক্ষা শেষে রাজ্যপরিচালনার কাজে নতুনদের যুক্ত করে গণরাজ্য তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। গণের সব লোকেরাই মন্ত্রণার অধিকারী হয় না। গণের প্রধান ব্যক্তিরাই একমাত্র পরস্পর মিলিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় (১২/১০৫/২৩-২৪)।

শান্তিপর্বের এই অধ্যায়টিতে গণরাজ্যের শুধু প্রসংশাই করা হয়নি; রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান রাজাকে গণ বা সংঘের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের কথা বলা হয়েছে (১২/১০৫/১৫)। ২৩নং শ্লোকে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে গণরাজ্যের প্রধান ব্যক্তিদের সম্মান করতে, কারণ রাজ্যপরিচালনার প্রচুর দায়িত্ব এই সমস্ত ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত থাকে। তাছাড়া, ঐক্যবদ্ধ গণরাজ্যকে বাইরের শত্রুদের পক্ষে পরাজিত করা কষ্টকর (১২/১০৫/২৮)। সুতরাং, রাজার উচিত হ'ল গণরাজ্যের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া।

গণরাজ্য অত্যন্ত শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে প্রশংসিত হ'লেও গণরাজ্যের ত্রুটিগুলি সম্পর্কেও এই অধ্যায়টিতে আলোচনা করা হয়েছে। ঐক্য যেমন গণরাজ্যের ভিত্তি, অনৈক্য গণরাজ্যের ধ্বংসের কারণ। পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হ'লে ভিন্ন ভিন্ন মত গড়ে ওঠে ও পৃথক পৃথক বহু দলের সৃষ্টি হয়। এর ফলে, গণরাজ্যে প্রধান ব্যক্তিগণ স্ব স্ব প্রধান হয়ে পড়েন এবং গণরাজ্যের পরিচালনা কষ্টকর হয়ে ওঠে (১২/১০৫/২৪,২৫)। বিভিন্ন কুলগোষ্ঠী বা বংশে যে সমস্ত ঝগড়া বিবাদ দেখা দেয় তা যদি কুলগোষ্ঠীর বয়স্ক ব্যক্তিরা উপেক্ষা করেন বা মীমাংসা করতে ব্যর্থ হন তাহলে সেই সব ঝগড়া বিবাদ বিভিন্ন কুল বা বংশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে (১২/১০৫/৩০-৩২)।

দ্বিতীয়ত, ক্রোধ, মোহ বা লোভ গণরাজ্যের বিভিন্ন কুল বা গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করে। প্রথমে একজন মানুষ লোভের বশবর্তী হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় অন্যদের মধ্যেও এই প্রবণতা দেখা যায়। এভাবে সকলেই লোভ ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে রাজ্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে থাকে। নিজেদের মধ্যে খুনোখুনিও শুরু হয়। ফলে দেশের মধ্যে এক চরম অরাজকতা দেখা দেয় (১২/১০৫/১১-১৩)।

তৃতীয়ত, ২২নং শ্লোকে বলা হয়েছে, গণরাজ্যের লোকেদের মধ্যে যদি ক্রোধ, ভেদ, ভয়, আঘাতে অপরকে দুর্বল করা বা হত্যা করার প্রবৃত্তি গড়ে ওঠে তাহলে তাড়াতাড়ি গণরাজ্য শত্রুর দ্বারা পরাজিত হয়। গণরাজ্যের মধ্যেকার বিরোধ গণরাজ্যকে দুর্বল করে তোলে এবং এর ফলে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে মেকাবিলা করতে পারে না। তাছাড়া, গণরাজ্যর সৈন্যরা যদি ঠিক সময়ে ভোজন ও বেতন না পায় তাহলে তারা বিচ্ছিন্ন হ'তে থাকে এবং শত্রু পক্ষে যোগ দিতে থাকে (১২/১০৫/১৩)।

সর্বোপরি, গণরাজ্য সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বর্ণগত বা কুলগত বৈষম্য থাকে না। বংশগত

ও বর্ণগত বৈষম্য না থাকায় গণরাজ্যের সব মানুষ সমান হ'তে পারে কিন্তু উদ্যোগ, বুদ্ধি, রূপ ও সম্পত্তিতে সকলের এক হওয়া অসম্ভব। উদ্যোগ, বুদ্ধি, রূপ ও সম্পত্তির ভিন্নতাকে স্বীকার না করায় গণরাজ্যে উদ্যোগের অভাব যেমন ঘটে অপরদিকে এই ভিন্নতার ফলে শত্রুরা গণরাজ্যের মানুষের মধ্যে সহজেই বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে গণরাজ্য এক বড় সংকটের সম্মুখীন হয়।

উপরের এই আলোচনায় আমরা গণরাজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ দেখেছি। এই অসুবিধাগুলির মধ্যে বেশ কিছু অসুবিধা আমাদের আজকের এই গণতন্ত্রের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করি; যেমন অনৈক্য, দলাদলি, জাতীয় সম্পত্তি আত্মসাৎ প্রভৃতি প্রবণতা আমাদের গণতন্ত্রেও অত্যন্ত প্রকট। যদি আমরা গণতন্ত্রের সমস্যাগুলি জানতে পারি তাহলে সেই সমস্যাগুলি মোকাবিলা করার জন্য আমরা তৎপর হ'তে পারব।

৩৪.৭ রাষ্ট্রের প্রকৃতি বা উপাদানসমূহ—সপ্তাঙ্গতত্ত্ব

কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা রাষ্ট্রের প্রকৃতি বা উপাদান (সপ্তাঙ্গতত্ত্ব) সম্পর্কে এক বিস্তারিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনা দেখতে পাই। মহাভারতের শান্তিপর্বে রাষ্ট্রের প্রকৃতি বা উপাদান সম্পর্কে এই সপ্তাঙ্গতত্ত্বের উল্লেখ থাকলেও বিস্তারিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আলোচনা হয়নি। ৬৯নং অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতে গিয়ে ভীষ্মদেব রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গের তথা সপ্ত প্রকৃতির উল্লেখ করেন। এগুলি হ'ল---রাজা স্বয়ং, অমাত্য, কোষ, দণ্ড, মিত্র, জনপদ ও পুর। এখানে দুর্গ শব্দটি ব্যবহারের পরিবর্তে পুর শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। দুর্গ, পুর, রাজধানী শব্দগুলির অর্থ এখানে একই। আবার ১২১নং অধ্যয়ে রাষ্ট্রের সপ্ত প্রকৃতি ও অষ্ট অঙ্গযুক্ত বল এর কথা বলা হয়েছে। সপ্তপ্রকৃতির নাম আমরা আগেই পেয়েছি। অষ্টঅঙ্গযুক্ত বল বলতে হাতি, ঘোড়া, রথ, পদাতিক বাহিনী, নৌকা, বেতনভোগী কর্মচারী, দেশের প্রজা ও পশুকে বোঝানো হয়েছে। এই অষ্ট অঙ্গযুক্ত বল হ'ল রাজার আহার্য বল। এছাড়া, রাজার চার ধরনের প্রকৃতি বল রয়েছে যেমন---কুল বা বংশ, ধনসম্পদ, মন্ত্রী ও বুদ্ধি (১২/১২১/৪৩-৪৭)। শান্তিপর্বের বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত রাষ্ট্রের এই সপ্তপ্রকৃতির বিষয়ে আলোচনা করব। তবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রতিটি প্রকৃতি বা উপাদান নিয়ে যে ধরনের শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনা রয়েছে শান্তিপর্বে সেরকমের আলোচনা করা হয়নি। বিভিন্ন অধ্যায়ে ছড়িয়ে থাকা বিষয়গুলিকে এক জায়গায় নিয়ে এসে আলোচনা করতে হবে। জনপদ নিয়ে কোনও বিস্তারিত আলোচনা না থাকায় আমরা এই বিষয়টি বাদ দেব।

৩৪.৭.১ রাজা

কোটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বে স্বামী তথা রাজাই প্রধান উপাদান। শান্তিপর্বে যদিও রাজধর্মকে প্রধান বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তথাপি রাজার পরিবর্তে দণ্ডই এখানে প্রধান। দণ্ডই রাজ্যের প্রধান উপাদান এবং অন্যান্য সব উপাদানগুলির উৎপত্তির কারণ। ঈশ্বর যত্নসহকারে প্রজাপতিপালন ও সব বর্ণের মানুষকে নিজ নিজ ধর্মে সংস্থাপনের জন্য, অর্থাৎ বর্ণ অনুযায়ী নিজ নিজ কাজ করার জন্য রাজার হাতে যে দণ্ডকে অর্পণ করেছেন তার চেয়ে অধিক পূজনীয় বলে রাজার আর কিছু নেই (১২/১২১/৪৮)। রাজার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আমরা এর আগেই আলোচনা করেছি। এখানে আমরা রাজার সঙ্গে পুরোহিতের সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনা